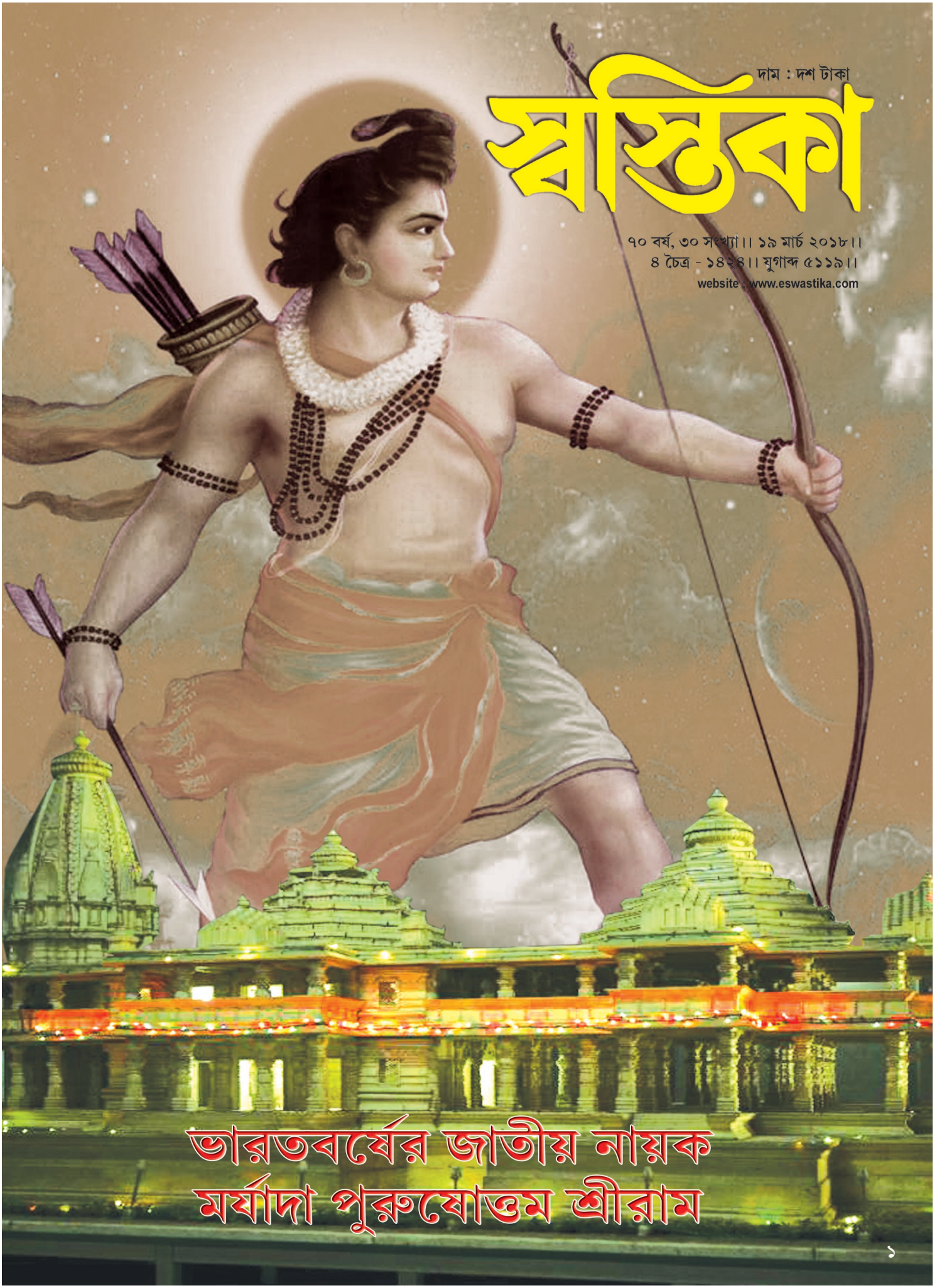

দাম : দশ টাকা
স্বস্তিকা
৭০ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ১৯ মার্চ ২০১৮।।
৪ চৈত্র - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।।
website : www.eswastika.com
ভারতবর্ষের জাতীয় নায়ক
মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ৪ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১৯ মার্চ - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

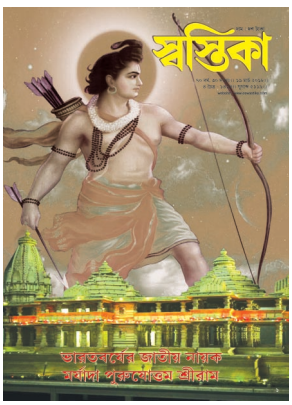

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

খোলা চিঠি : গভীর অসুখ সারাবে কে?
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১০

সি পি এম যদি দু'টুকরো হয় তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১১

সংখ্যাতত্ত্বে পাশ, তবু আট রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু তকমা পেতে ফেল কেন? ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১২

ত্রিপুরা জয়ের কারিগর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ
▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ১৪

রাজনীতি যখন অর্থনীতির অনুঘটক
▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৬

রামমন্দির কবে, জানতে চায় মানুষ
▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ১৯

'তুঁহুঁ বিনা জীবন কৈসে সমায়া প্রভু রাম'
▯ ড. তুষারকান্তি ঘোষ ▯ ২০

রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ▯ ২৩

উত্তর-পূর্ব ভারতের নির্বাচনী ফলাফল ২০১৯-এর খেলা বদলে দিল ▯ নলিন মেহতা ▯ ২৭

শ্রীরাম ঐতিহাসিক চরিত্র প্রমাণ দিতে পারে রামসেতু
▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩১

ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার ট্রাডিশন এখনও চলছে
▯ বরুণ দাস ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৭ ▯ অন্যরকম : ৩৮ ▯ খেলা : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ স্মরণে : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মূর্তি ভাঙার রাজনীতি

কেওড়াতলা গঙ্গা তীরবর্তী স্থান। সম্প্রতি সেখানে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি ভাঙা হয়েছে। অভিযোগের তির র‍্যাডিক্যাল নামের অতি-বাম এক সংগঠনের দিকে। অন্তঃসারশূন্য বাম রাজনীতির এর থেকে বড়ো গঙ্গাযাত্রা আর কীই বা হতে পারে! স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় আলোচ্য বিষয়— মূর্তি ভাঙার রাজনীতি! জাতীয় এবং আঞ্চলিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মূর্তি ভাঙার রাজনীতির উত্তর খুঁজবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, চন্দ্রভানু ঘোষাল, অমলেশ মিশ্র, অচিন রায় প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ইতিহাস পুনর্লিখন জরুরি

সমগ্র মানব জাতির জন্য ভারতবর্ষের যে অবদান বিশ্বে স্বীকৃত তাহার উৎসস্থল প্রাচীন ভারত। যদিও প্রাচীন ভারতের অনেকটাই এখনও অজানা। আমরা এখন ভারতবর্ষের যে ইতিহাস জানি, তাহার বেশিরভাগটাই ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদ কিংবা মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসীদের রচিত। ভারত আক্রমণকারী এবং মন্দির ও মন্দিরের মূর্তি ভঙ্গকারী মহম্মদ গজনি ও মহম্মদ ঘোরিও তাহাদের দৃষ্টিতে মাত্র লুণ্ঠনকারী হিসাবে চিহ্নিত। ভারতবর্ষকে যাহারা বিধর্মী ও মূর্তিপূজকদের দেশ হিসাবে ঘৃণা করিত। বৃটিশ শাসনের অবসানের পর যদি আমরা প্রকৃতই ঔপনিবেশিকতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে চাহিতাম, তাহা হইলে আমাদের দেশের ইতিহাসকে যেভাবে বিকৃত করা হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিতে পারিতাম। এখন তাহাদের রচিত সেই বিকৃত ইতিহাসই স্কুলপাঠ্য। এই ইতিহাস বিকৃতির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা হয় নাই, কেননা তাহা করিলে মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হইবে। অর্থাৎ নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য সেই তোষণের রাজনীতি।

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার রচিত স্মৃতিকথায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চ প্রশংসা করিলেও এক অজানা কারণে তিনিও আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার কোনও প্রয়াস করেন নাই। তাই স্বাধীনতার পরও ভারতীয় মানসে ঔপনিবেশিকতার প্রভাব ক্রিয়াশীল। বর্তমান ভারতের ছেলে-মেয়েরা আজ তাই নিজেদের দেশের ইতিহাস অপেক্ষা আমেরিকার ইতিহাস বেশি জানে। সম্প্রতি লন্ডনের আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্স-এর এক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, নরেন্দ্র মোদী সরকার ভারতবর্ষের ইতিহাস পুনর্লিখনের জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছে। সংবাদটি সত্য হইলে স্বাগত। কিন্তু ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি হিন্দু মৌলবাদীদের ইতিহাসের পুনর্লিখন হিসাবে শিরোনামে স্থান পাইয়াছে। সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুডে আয়োজিত সভায় সোনিয়া গান্ধী দলিত ও মুসলমানদের আক্রমণকারী হিসাবে গোরক্ষকদের তীব্র নিন্দা করিবার পাশাপাশি ইতিহাস পুনর্লিখন প্রচেষ্টারও সমালোচনা করিয়াছেন।

ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, ভারতীয় ছেলে-মেয়েরা জানে না যোগের আবিষ্কার কোথায় হইয়াছে, শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতই অযোধ্যার একজন রাজা ছিলেন, না মিথ? এইসব তথ্য জানিবার অধিকার তাহাদের রহিয়াছে। যে সভ্যতা সংস্কৃতের মতো এক সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক ভাষার জন্ম দিয়াছে সেই প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে তাহাদের জানিবার অধিকার আছে। এইসব অবদান যাঁহাদের, তাঁহাদের পরিচয় কী? তাঁহারা কি সত্যই ইউরোপ হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন যাহা ঔপনিবেশিক ও মার্কসীয় ইতিহাসবিদরা আমাদের বিশ্বাস করাইতে নিরন্তর প্রচেষ্টা করিতেছেন? সরস্বতী নদীর তীরে এক প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল যাহা এই নদীর বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হইয়া যায়। আজ এইসব বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার সময় হইয়াছে। ইতিহাস পাঠ্য বিষয়গুলির পুনঃপরীক্ষার জন্য সরকারি উদ্যোগকে যাহারা নিন্দা করিতেছেন তাহাদের স্মরণ রাখা দরকার, নবীন প্রজন্মের ভারতীয়দের এইসব তথ্য জানিবার অধিকার আছে। এই কারণেই ইতিহাস পুনর্লিখন জরুরি এবং তাহা অবশ্যই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক, নথি ও নির্দশন বা আকরের ভিত্তিতে।

সুভাষিতম্

বাল্যে চৈব চরেদ্ধর্মং অনিত্যং খলু জীবিতম্।

ফলানামপ্যপক্কানাং শাশ্বতং পতনং ভবেৎ।। (চাণক্যনীতি)

জীবন যেহেতু অনিত্য, তাই বাল্যকালেই ধর্মাচরণ করা উচিত। কারণ অধিকাংশ ফল যেমন অপক্ক অবস্থায় ভূপতিত হয়, মনুষ্যজীবনও জানবে সেইরূপ।

কৃষক সমস্যার সমাধানে সরকারের সংবেদনশীল হওয়া উচিত : ভাইয়াজী যোশী

সাংবাদিক সম্মেলনে ভাইয়াজী।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় সরকার্যবাহ হিসেবে চতুর্থবার পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ভাইয়াজী যোশী। নাগপুরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী যোশী সারা দেশে কৃষকদের সমস্যার সমাধানে আরও সংবেদনশীল হওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। গত ১১ মার্চ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারক অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভাইয়াজী যোশীকে চতুর্থবারের জন্য সরকার্যবাহ হিসেবে পুনর্নির্বাচিত করে। এই উপলক্ষে রেশমবাগ চত্বরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দেশ সমাজ ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত সমসাময়িক নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ভাইয়াজী। মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক কৃষক-বিক্ষোভ এবং সারা দেশে কৃষিজীবী মানুষের অস্থিরতা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, দেশের কৃষকেরা নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। তাদের সমস্যার বাস্তবানুগ সমাধান খোঁজার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তবে সরকারের উচিত কৃষকদের সমস্যার সমাধানে আরও সংবেদনশীল হওয়া। সেই সঙ্গে কৃষকদেরও বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষি-সম্পর্কিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং কৃৎকৌশল শিখে নিতে হবে। অন্যথায় তাঁদের উৎপাদনে কোনও পরিবর্তন হবে না।

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভাইয়াজী বলেন, রামমন্দির শুধুমাত্র অযোধ্যাতেই তৈরি হবে। অন্য কোথাও নয়। তবে তার জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সকলকে যেতে হবে। বিষয়টি এখন আদালতের বিচারাধীন। বিতর্কিত জমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলায় আদালত কী রায় দেয় তা জানার জন্য আমরা সকলেই অপেক্ষা করছি। রায় ঘোষণার পর মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হবে। তিনি বলেন, 'এই বিষয়ে ঐকমত্য গুরুত্বপূর্ণ। আবার এটাও সত্যি এরকম একটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছনো বেশ কঠিনও।' আর্ট অব লিভিং-এর প্রবক্তা শ্রীশ্রী রবিশংকর রামমন্দির সম্পকে সম্প্রতি যা বলেছেন তা কতটা গ্রহণযোগ্য? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাইয়াজী বলেন, 'রামমন্দির আন্দোলনের গোড়া থেকে যারা এর সঙ্গে রয়েছেন তাদের সকলের মতামতই মূল্যবান।'

ত্রিপুরা-সহ সমগ্র উত্তরপূর্ব ক্ষেত্রে বিজেপির সাম্প্রতিক নির্বাচনী জয় প্রসঙ্গে ভাইয়াজী বলেন, 'সেখানে আমাদের কার্যকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তবে ত্রিপুরায় বিজেপি শুধু সঙ্ঘের জন্য জেতেনি। এই জয়ের নেপথ্যে রয়েছে ত্রিপুরার মানুষের পালাবদলের জন্য আকাঙ্ক্ষা। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় পরিস্থিতি বিজেপির অনুকূলে ছিল। সেটাই ফুটে উঠেছে তাদের জয়ে। অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'দেশের প্রতিটি সাধারণ মানুষ সরকারের পিছনে থাকতে চায়। সরকারের কাজগুলির মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ হতে চায়।' লিঙ্গায়ত ইস্যু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষে নানা ধরনের সম্প্রদায় আছে। আবার তাদের মধ্যে মূলগত একটা ঐক্যও আছে। আমরা সেই মূলগত ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে চাই যাতে সমস্ত রকমের ভেদাভেদ থেকে দেশ মুক্ত হতে পারে।'

সরকার্যবাহ বলেন, অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় সাম্প্রতিক সময়ের একটি বিপজ্জনক প্রবণতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় ভাষা এবং উপভাষাগুলি বিদেশি ভাষার ক্রমবর্ধমান প্রভাবে এবং বিদেশি শব্দের যথেচ্ছ অনুপ্রবেশে বিপন্ন। সঙ্ঘ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য বিদেশি ভাষাশিক্ষার বিরোধী নয়। কিন্তু এর পাশাপাশি ভারতীয় ভাষাগুলির সংরক্ষণেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে সঙ্ঘ মনে করে। তার জন্য অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় একটি প্রস্তাবও পাশ হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, 'মাতৃভাষা, উপভাষাগুলির যথাযথ সংরক্ষণ এবং সেইসব ভাষার সাহিত্যিক পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমরা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে অনুরোধ করছি। দেখতে হবে, দৈনন্দিন প্রয়োজনে আমরা যেন শুধু মাতৃভাষাই ব্যবহার করি। ভারতের ভাষাগুলি জানলে তবেই আমরা ভারতকে জানতে পারব।'

উপভাষা সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ভারতের বেশিরভাগ উপভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। কিন্তু এইসব ভাষায় প্রবহমান প্রাচীন পরম্পরা এবং সাহিত্য লিপিবদ্ধ করার জন্য স্থানীয় অথবা দেবনাগরী বর্ণমালায় ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত তিনি সম্প্রতি বোড়ো সাহিত্য পরিষদের দেবনাগরী লিপি ব্যবহারের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে তিনি ভারতীয় ভাষা লেখার জন্য রোমান লিপি ব্যবহারের বিরোধিতা করেন।

সঙ্ঘ-অনুপ্রাণিত কয়েকটি সংগঠনের মোদী-বিরোধিতা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রতিটি সংগঠনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। আবার সরকারেরও কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। যার ফলে সবাইকে সন্তুষ্ট

করা তাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। সংগঠনগুলি যে-যার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিচল থাকে এবং যখন যেমন দরকার সেইমতো দায়িত্ব পালন করে। এর ফলে হয়তো কখনও কখনও মতান্তর হবে কিন্তু মনান্তর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

পঞ্জাব এবং কেরলে রাজনৈতিক হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এরকম ঘটনা যাতে আদপেই না ঘটে সেটা সরকারের দেখা উচিত। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডে যুক্ত অপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সঙ্ঘ হত্যার রাজনীতির বিরোধী। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে নিহত ব্যক্তির পরিবারের পাশে সঙ্ঘ সবসময়েই থাকেন। সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দেয়। দেশে বাড়তে থাকা অর্থনৈতিক অপরাধ প্রসঙ্গে ভাইয়াজী বলেন, 'এসব ক্ষেত্রেও সরকারের কড়া পদক্ষেপ করা উচিত। বিশেষ করে ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য সিস্টেমকে আরও সুসংবদ্ধ করা দরকার।

ত্রিপুরায় বিজেপি জেতার পর লেনিনের মূর্তি ভাঙা হয়েছে। সাংবাদিকরা এই নিয়ে প্রশ্ন করলে ভাইয়াজী জানতে চান, 'পঞ্জাবে আর কেরলে যে নিত্যদিন স্বয়ংসেবকেরা খুন হচ্ছেন সে ব্যাপারে তো আপনারা জনমত তৈরি করার কথা ভাবেন না! তাহলে মূর্তি ভাঙা নিয়ে প্রশ্ন কেন?' পরে তিনি বলেন, সঙ্ঘ মূর্তিভাঙা বা এই ধরনের কাজকর্মের বিরোধী। যে-কোনও ধরনের অসহিষ্ণুতা এবং সংশয় ও দ্বন্দ্ব তৈরির প্রয়াস বিপজ্জনক। প্রশাসনের উচিত এসব কড়া হাতে মোকাবিলা করা। সামাজিক সম্প্রীতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনওকিছুই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।

সব শেষে ভাইয়াজী যোশী বলেন, হাজার হাজার স্বয়ংসেবকের কঠিন পরিশ্রমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সারা দেশের ৬ লক্ষ গ্রামে পৌঁছে যাওয়া যা সঙ্ঘের পক্ষেও খুব সহজ কাজ ছিল না। এর জন্য নয় দশক সময় লেগেছে। সঙ্ঘ কোনওদিনই চটজলদি সাফল্যে বিশ্বাসী নয়। সঙ্ঘের মূল লক্ষ্য মানুষ তৈরি করা। সমাজের সর্বস্তরে সদর্থক ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া। যাতে সদর্থক ভাবনায় জারিত প্রকৃত মানুষ এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে অনেকদূর।

আবুধাবিতে নরেন্দ্র মোদীর হিন্দু মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সভ্যতার স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাজধানী আবুধাবিতে গিয়ে স্থাপন করেছেন প্রথম একটি হিন্দু মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর। তথ্যাভিজ্ঞ মহল একে শুধু মোদীর কূটনৈতিক সাফল্যই নয়, 'বিশ্বগুরু ভারত' নির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবেও দেখছে। সেই কথাই এই প্রতিবেদককে শোনাচ্ছিলেন প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য। কর্মজীবনের সূত্রে দীর্ঘ একযুগ সময় তাঁর কেটেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিভিন্ন শহরে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন দুবাইয়ে বিশেষ করে হিন্দুদের ধর্মাচরণের কোনও সুযোগ ছিল না। সেখানে একটি ফ্ল্যাটের ভিতর লুকিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্থানীয় হিন্দুরা। এখানে যে মন্দির আছে বাইরের লোকের কাছে তা যথাসম্ভব গোপনীয় ছিল। প্রতি শুক্রবার এখানে স্বামী চিন্ময়ানন্দের উৎসাহে শাস্ত্রালোচনার আসর বসতো।

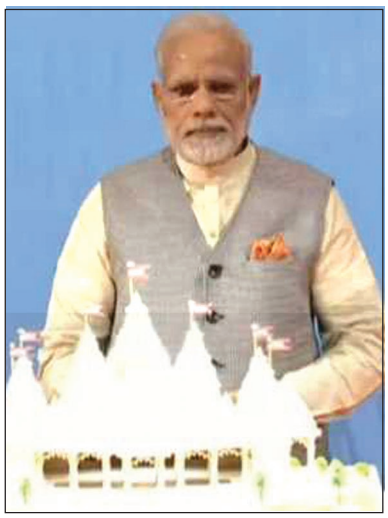

আবুধাবিতে মন্দিরের নকশা হাতে প্রধানমন্ত্রী।

শ্রীআচার্য উদ্যোগী মানুষ। হিন্দুদের ধর্মাচরণের বিষয়ে তিনি সেদেশে একাধিকবার দরবার করেছেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কাছে। কিন্তু ভারতের সরকারি নীতির দোহাই দিয়ে সেদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। নৃপেনবাবুর কুয়েতের অভিজ্ঞতা অবশ্য আরও ভয়াবহ। কুয়েতে হিন্দুদের শবদাহের অধিকারটুকু পর্যন্ত ছিল না। একবার ৪৫-৪৬ বছরের এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের অকাল প্রয়াণ ঘটলে কুয়েতের বিদেশ-মন্ত্রকের সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রদূতের বিশেষ বৈঠকের পর শব দাহ করা সম্ভব হয়েছিল। অনেক ভারতীয়ই 'আরবে মরেও শান্তি নেই' বলে বয়স থাকতে থাকতেই এদেশে ফিরে আসতেন।

কুয়েতে খ্রিস্টানদের ওপরও একইরকম দমনপীড়ন চলতো। সেদেশের আমিরি ফতোয়া ছিল কোনও গির্জা চালানো যাবে না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এনিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দেওয়াতে পিছিয়ে আসে কুয়েত প্রশাসন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথোপকথনে নৃপেনবাবু বুঝতে পেরেছিলেন ভারত-সরকারের 'সেকুলার নীতি' বড়ো দায়। নইলে ব্রিটিশ সরকার যেমন তাদের নাগরিকদের ধর্মাচরণের সুযোগটুকু আদায় করতে পারে, ভারত সরকার তা করতে পারে না কেন? এই পরিস্থিতিরই আমূল বদল ঘটিয়েছে মোদী সরকার। এই সরকার 'সেকুলারিজমে'র নামে ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেয় না, নিজের দেশের নাগরিকদের পরবাসে বঞ্চিত করে না বলে স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য।

প্রসঙ্গত, দুবাইয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও বেশি। প্রায় পঞ্চান্ন হাজার বর্গফুটের বিশাল এলাকায় মন্দিরটি তৈরি হচ্ছে এবং ২০২০ সালের মধ্যে উপাসনা-পদ্ধতি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এই মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হবে। নরেন্দ্র মোদীর এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে বিদেশের সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলেও এদেশের প্রতিটি নাগরিককে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দেবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল আশা প্রকাশ করছেন।

৩৬ শতাংশ আইনপ্রণেতার বিরুদ্ধে রয়েছে ফৌজদারি মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সুপ্রিম কোর্ট থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক তথ্যে সারা দেশে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের একটি করাল ছায়া ফুটে উঠেছে। দেশের মোট সাংসদ ও বিধায়কদের মধ্যে ১৭৬৫ জনের অর্থাৎ ৩৬ শতাংশ আইনবেত্তাদের বিরুদ্ধে ৩০৪৫টি ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত মামলা ঝুলছে। সংসদ ও সারা দেশের বিধানসভাগুলি মিলিয়ে মোট আইনপ্রণেতার সংখ্যা বর্তমানে ৪৮৯৬ জন। দেশে এই প্রথম কোনও সরকার এই মামলাগুলি সংক্রান্ত বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের ওপর জোর দিয়েছে যাতে ফাস্ট ট্রাক কোর্টের মাধ্যমে শুনানি করে সেগুলি বছর না ঘুরতেই ফয়সালা করা যায়। মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতে দাখিল করা হিসেব অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশের আইনপ্রণেতারাই সর্বাধিক মামলায় জড়িত। এর পরই রয়েছে তামিলনাড়ু, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরলের নাম। এই সূত্রে মহারাষ্ট্র ও গোয়া থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য না আসায় রাজ্য দু'টির স্থান নির্ধারণ করা যায়নি। কেন্দ্রের ও নির্বাচন আয়োগের হাতে কোন আইনপ্রণেতার বিরুদ্ধে ঠিক কতগুলি মামলা আছে তার সঠিক হিসেব না থাকায় সর্বোচ্চ আদালত কেন্দ্রকে এ বিষয়ে ২ মাসের সময়সীমা দিয়ে সম্পূর্ণ তথ্য তৈরি করে আদালতে জমা দিতে বলেছে যাতে সঠিক সংখ্যায় প্রয়োজনীয় 'বিশেষ আদালতগুলি' দ্রুত গঠন করে এই মামলাগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শোনা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'অ্যাসোশিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস্'- এর হিসেব অনুযায়ী ১৫৮১টি মামলা এই বিষয়ে ঝুলে রয়েছে। ২০১৪ সালের ক্ষমতা দখলের পর নতুন সরকার ১২টি ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা মামলাগুলির নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ নেয়। ২০১৪ সালে ঝুলে থাকা ১৫৮১টি মামলা আজকের তারিখে ৩০৪৫- এ পৌঁছনোয় বিশেষ আদালতের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হবে। মামলার আবেদনকারী অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায়ের দাবি অনুযায়ী অমীমাংসিত মামলার সংখ্যা আসলে ১৩৫০০-র আশ পাশে।

এই সূত্রে কেন্দ্রীয় সরকার আদালতকে আশ্বস্ত করে জানায় যে, পূর্বে গঠিত ১২টি বিশেষ আদালত খুব শীঘ্রই কাজকর্ম শুরু করবে। কেননা নির্দিষ্ট উচ্চ আদালতগুলি এই মর্মে ইতিমধ্যেই সূচনা জারি করেছে। সূত্র অনুযায়ী, কেন্দ্র এ বাবদ ৭.৮০ কোটি টাকা যে যে রাজ্যে মামলা শুরু হবে তাদের জন্য বরাদ্দ করেছে। শুধু রাজধানী দিল্লিতেই ২টি বিশেষ আদালত গঠন করে ২২৮ জন সাংসদের বিরুদ্ধে আনীত মামলাগুলির বিচার হবে। বাকি ১০টি আদালত চালু হবে উত্তরপ্রদেশ, তামিল নাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার-সহ আরও ৫টি রাজ্যে যেখানে এই সূত্রে দাগি বিধায়কের সংখ্যা প্রত্যেকটিতে ৬৫- এর বেশি।

রাজ্যসভায় বিরোধী আঁতাত রুখতে তৈরি বিজেপিও

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সপা-বসপা-কংগ্রেসের যে অশুভ আঁতাত রাজ্যসভা ভোটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উত্তরপ্রদেশে তাকে ভাঙতে কোমর বেঁধে নামছে বিজেপি। অন্যদিকে দেশবিরোধী ত্রিমূর্তির সাহায্যে গুজরাটকে অশান্ত করতে কংগ্রেসি চক্রান্তের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে তৈরি বিজেপি। উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি আসনের মধ্যে বিজেপির দখলে ৩২৫টি আসন। রাজ্যসভার আসন সংখ্যা ১০। প্রতি রাজ্যসভার প্রার্থীর জয়ের জন্য দরকার ৩৭টি ভোট। এই হিসেবে বিজেপির আট প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত। তারপরেও উদ্বৃত্ত থাকছে ২৯টি ভোট। অন্যদিকে সমাজবাদী পার্টির বিধানসভায় আসন ৪৭টি। তাদের প্রার্থী জয়া বচ্চনকে রাজ্যসভায় জেতানোর পরও উদ্বৃত্ত থাকবে আরও ১০টি ভোট। যে ভোটগুলো বহুজন সমাজ পার্টিকে দিয়ে রাজ্যসভার দশম সদস্য হিসেবে বিএসপি প্রার্থীকে জেতানোর চেষ্টা হবে।

এই দশম সদস্য নিয়েই চলছে টানাপোড়েন। বিজেপির নবম প্রার্থী হয়েছেন অনিল আগরওয়াল। বিজেপির আশা ২৯টি বাড়তি ভোটের সঙ্গে আরও আটটি ভোট জোগাড় হয়ে যাবে। যেমন তিন নির্দল প্রার্থী, সমাজবাদী পার্টির রাজ্যসভার সদস্য দলত্যাগী নরেশ আগরওয়ালের পুত্র বিধায়ক নীতীন আগরওয়ালের ভোট ইতিমধ্যেই সুনিশ্চিত করে ফেলেছে বিজেপি।

এই হিসেবে সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজপার্টি ও কংগ্রেসের মিলিত ভোটও ৩৫-এ এসে আটকে যাচ্ছে। কারণ নীতিন আগরওয়ালকে বাদ দিলে সমাজবাদী পার্টির অতিরিক্ত দশটি ভোটের মধ্যে ৯টি, বিএসপি-র ১৯ ও কংগ্রেসের ৭টি ধরলে ৩৫-ই হয়। তাই দেখার বিজেপি অতিরিক্ত চারটি না ওই জোট অতিরিক্ত দু'টি ভোট জোগাড় করতে পারে।

অন্যদিকে ১৮২ আসনবিশিষ্ট গুজরাট বিধানসভায় বিজেপি ৯৯, কংগ্রেস ৭৭। যা হিসেব তাতে উভয়েরই দু'টি করে রাজ্যসভায় আসন জেতার কথা। তবে হিসেব উল্টোতে পারে ছয় নির্দল প্রার্থী। কানাঘুষোয় শোনা যায় হার্দিক জিগনেশদের দৌরাত্ম্যে আদি কংগ্রেসিদের একাংশ চূড়ান্ত বিরক্ত। এঁদের ওপর ভরসা করেই গুজরাটের প্রাক্তন মন্ত্রী কিরীট সিংহ রানাকে তৃতীয় প্রার্থী করেছে বিজেপি। তবে বিজেপির এই অতিরিক্ত প্রার্থীরা জিতুন আর নাই জিতুন এই ভোটের পর রাজ্যসভায় বিজেপির শক্তিকে যে অনেকটাই বাড়বে তা বলা বাহুল্য।

সৌরশক্তির সমর্থনে নরেন্দ্র মোদীর জোরালো সওয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত এবং ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি দিল্লিতে আন্তর্জাতিক সৌরশক্তি সামিট (ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স সামিট) হয়ে গেল। সারাবিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২৩ জন প্রেসিডেন্ট এবং ১০ জন ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠানটি হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আপনাদের সকলের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম সৌর প্ল্যান্টাটিও তৈরি করা সম্ভব হতো না। আমি আপনাদের সকলের কাছে এবং ফ্রান্সের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।' সারা বিশ্বে সৌরশক্তি উৎপাদনে সক্ষম ১২১টি দেশের মধ্যে ৬১টি দেশ ভারত-ফ্রান্সের পরিচালনাধীন সৌরজোটে শামিল হয়েছে। ৩২টি দেশ পরে চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করবে বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, হাজার হাজার বছর আগে বেদে সূর্যকে সারা বিশ্বের আত্মা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। এখনও ভারতে সূর্যকে দৈহিক পুষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে মানা হয়। আমাদের মধ্যে যারা বিশ্ব-উষ্ণায়ণের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করি, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কথা তাদেরই বিশেষ করে ভাবা দরকার। মানুষের প্রাচীনতম দর্শন এই বিষয়ে কী বলেছে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। আমাদের ভবিষ্যৎ কতটা সবুজ হবে বা কতটা বিবর্ণ তা নির্ভর করে আমাদের সম্মিলিত জীবনদর্শন ঠিক কেমন, তার ওপর।' প্রধানমন্ত্রী জানান বিশ্বের বৃহত্তম পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাঁর কথায়, '২০২২ নাগাদ আমরা ১৭৫ গিগাওয়াট (১ গিগাওয়াট = ১০০০ মেগাওয়াট) বিদ্যুত উৎপাদনে সক্ষম হয়ে উঠব। যার মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট সৌরশক্তি।' সামিটে যৌথভাবে সভামুখ্যের দায়িত্ব পালন করেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাকরঁ।

ঝাড়খণ্ডে এক টাকায় পুকুর লিজ দেবে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শক্তিশালী ঝাড়খণ্ড তৈরি করতে হলে মেয়েদেরও সমান অংশীদারিত্ব দরকার। সখী মণ্ডল প্রকল্প উদ্বোধন করে এই কথা বলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস। এই প্রকল্পে মেয়েদের মাত্র এক টাকায় পুকুর লিজ দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস বলেন, সরকারের লিজ দেওয়া পুকুরে মেয়েরা মাছ চাষ করতে পারবে। তাদের ব্যবসাও অল্প দিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবে। উল্লেখ্য, এই প্রকল্প শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যই পরিকল্পিত। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী আরও কয়েকটি প্রকল্প ঘোষণা করেন। এই সব প্রকল্পে মুখ্য উদ্দেশ্য গ্রামের মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। এদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মধুসংগ্রহ প্রকল্প। মধু উৎপাদনের জন্য মধুসংগ্রহের বাক্স মেয়েদের বিনামূল্যে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই আড়াই লক্ষ বাক্সের বরাত দেওয়া হয়েছে। মেয়েরা যে মধু সংগ্রহ করবেন তার সবই কিনে নেবে পতঞ্জলি ইনস্টিটিউট। মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েরা যে ঝার (যে মধু স্বাদে টক) মধু তৈরি করেন তা কিনে নেবে রাজ্য সরকার। বাজার নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে মেয়েদের নিষেধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, মধু কোথায় বিক্রি হবে তাই নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। বিদেশে ভারতীয় মধুর ভালো বাজার আছে। নারীর ক্ষমতায়নে ঝাড়খণ্ড সরকার গত কয়েক বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে। উন্নয়নমুখী বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী কার্যকলাপও অনেকাংশে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

উবাচ

"দেশের হিন্দুরা যখন নির্যাতিত হয়, তাদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়, বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়, তখন কি আপনি ওই নির্যাতিত হিন্দুদের কাছে গিয়েছেন?"

তসলিমা নাসরিন
বাংলাদেশি লেখিকা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে এক খোলা চিঠিতে

"বোঝা যাচ্ছে না, যারা বিদেশি শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করতে পারে, তাদের প্রতি এত সংবেদনশীলতা কেন? এর তদন্ত হওয়া উচিত।"

সুব্রহ্মণ্যম স্বামী
বিজেপি নেতা

পিতার হত্যাকারীদের রাহুল গান্ধীর ক্ষমা করা প্রসঙ্গে

"গত তিন বছরে বিশ্বকে ভারত ২৩ কোটি এল ই ডি সরবরাহ করেছে। এর ফলে ২০০ কোটি ডলার এবং ৪ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়েছে।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

দিল্লিতে প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনের উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সের উদ্বোধনী বক্তব্যে

"১৮০ কিলোমিটার হেঁটে এসে আজাদ ময়দানে জমায়েত হওয়া মানুষের ৯৫ শতাংশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকাজের কোনও সম্পর্ক নেই।"

দেবেন্দ্র ফড়নবিশ
মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র

মুম্বইয়ে বামপন্থী কৃষক সংগঠনের মিছিল প্রসঙ্গে

"সুপ্রিম কোর্ট শাহবানু মামলায় যা করতে পারেনি তিন তালাক মামলায় তা করেছে।"

জাস্টিস রঞ্জন গগৈ
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

তিন তালাক প্রসঙ্গে

গভীর অসুখ সারাবে কে ?

মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দিদি, আপনার এই পরিচয়টাই দিলাম। মুখ্যমন্ত্রী তো আপনি বটেই, কিন্তু স্বাস্থ্যও তো আপনারই হাতে। মনে আছে সেই যে দলের নেতা, মন্ত্রীদেরও আপনি বলে দিয়েছেন— "স্বাস্থ্য বিষয়টা আমি দেখব। আপনাদের মাথা ঘামাতে হবে না। কারও কোনও অভিযোগ থাকলে প্রশাসনকে জানান। আমরা ব্যবস্থা নেব, হম্বিতম্বি করবেন না।"

কিন্তু হম্বিতম্বি চলছেই। ফলে ক্রমশই খারাপের দিকে স্বাস্থ্যের ভবিষ্যৎ। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। গ্রামীণ বাংলার বড় অংশই সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা নির্ভর। আর এখন যদি সত্যিই গণ-ইস্তফা শুরু হয় কিংবা কর্মবিরতির পথে হাঁটেন চিকিৎসকরা, তখন বিপদ শুধু রাজ্য বা সরকারের নয়, আপনার দলেরও। আর আপনি এই ব্যাপারে কেন্দ্রকে দোষ দিতে পারবেন না। বলতে পারবেন না, বিজেপির জন্য ডাক্তাররা হাসপাতাল ছেড়ে পালাচ্ছে।

রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা এতটাই ক্ষুব্ধ যে তাঁরা গণ-ইস্তফা দিতে তৈরি। কিন্তু রোগীদের কথা ভেবে, সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা ধাক্কা খেতে পারে ভেবে ক্ষুব্ধ চিকিৎসকরা আপাতত স্থগিত রেখেছেন সিদ্ধান্ত। তবে আন্দোলনের পথ খোলা। কিন্তু কেন এত ক্ষোভ? কেন গণ-ইস্তফার ভাবনা? তথ্য বলছে, এমন ইচ্ছা অহেতুক নয়।

গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল মিলিয়ে ৮৫ জন চিকিৎসক কর্মরত অবস্থায় মার খেয়েছেন। হামলাকারীরা কখনও রোগীর আত্মীয়, কখনও সেটাও নয়। চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠলে তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করার আগেই শুরু হয়ে যায় বহিরাগতদের হামলা। এটা এই রাজ্যে নিত্য দিনের কথা।

ক'দিন আগেই চিকিৎসকদের ফেসবুক গ্রুপ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস্ ফোরাম'-এর একটি পোস্ট সামনে আসে। সেখানে ১৭ জন সরকারি চিকিৎসকের ইস্তফাপত্র জমা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ রয়েছে। অনেক চিকিৎসকই ভয়ে মুখ খুলতে পারছেন না, আবার অনেকেই হাসপাতালে মার খাওয়ার আশঙ্কায় চাকরি খোয়ানোর ভয়কে পাত্তা দিচ্ছেন না। অনেক জায়গায় মহিলা চিকিৎসকরাও আক্রান্ত হচ্ছেন।

তাদের বক্তব্য হলো, জেলায় জেলায় সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের বড় আতঙ্ক তৃণমূল নেতাদের দাদাগিরি। ভর্তি থেকে চিকিৎসা— সর্বত্র দাদাগিরি মেনে নিতে হচ্ছেই। আবার পান থেকে চুন খসলে তৃণমূল নেতা-কর্মীরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চালাচ্ছেন হামলা। চিকিৎসকরা বলছেন, পুলিশ আর শাসকদলের প্রশ্রয় না থাকলে এত সাহস হতে পারে না সাধারণ মানুষের।

এটা তো ঠিকই। শাসকদলের হম্বিতম্বি তো মানতেই হবে। সিন্ডিকেট চলছে, গোরুপাচার চলছে আর হাসপাতালে দাদাগিরি চলবে না? সেটা আবার হয় নাকি!

আমার মনে হয় ডাক্তারগুলোকে এবার একটু টাইট দেওয়া দরকার। একটা বুদ্ধি দিচ্ছি দিদি—ওদের স্পষ্ট করে বলে দিন, এসব চলবে। আর সব মেনেই থাকতে হয় থাক, যেতে হয় যাও।

—সুন্দর মৌলিক

সিপিএম যদি দু'টুকরো হয় তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই

দেশের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে কমিউনিস্টদের দ্রুত অপসারণ অনেককেই হয়তো অবাক করেছে। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩৪ বছর দাপিয়ে রাজত্ব করার পর হঠাৎ একদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়া থেকে, সাম্প্রতিককালে ত্রিপুরায় লালদুর্গ গুঁড়িয়ে যাওয়া সবই ইতিহাসের চেনা রাস্তায় ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার পর এবার কেরলেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াটা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। সারা বিশ্বেই এখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পার্টিকে পাল্টাতে হয়। এই সহজ কথাটা মার্কসবাদী নেতারা বোঝেননি। অথবা বুঝতে চাননি। বাঙালি কমিউনিস্ট নেতারা আজও খোসামুদে, ভাঁড় জাতীয় কমরেডদের তোল্লাই দেন। যেমন, গত রাজ্য বিধানসভার ভোট গণনার সময় সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র মশাই প্রতিদিন টিভি ক্যামেরার সামনে দাবি করতেন যে, পার্টি বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় ফিরছে। বলতেন, পার্টি ডবল সেঞ্চুরি করে এখন ট্রিপল সেঞ্চুরির দিকে চলেছে। ফলাফল ঘোষণার পর দেখা গেল সিপিএম প্রার্থীদের অধিকাংশের জামানত জব্দ হয়েছে। এমনকী, সূর্যকান্ত মিশ্রেরও বিশ্রী হার হয়েছে। নিজের আসন তিনি রক্ষা করতে পারেননি। এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, আলিমুদ্দিনের রাজ্য দপ্তরে খোসামুদে ভাঁড়রাই এখন কর্তাদের প্রিয় কমরেড। এই ভাঁড়রাই ডবল সেঞ্চুরির স্বপ্ন দেখিয়েছিল সূর্যকান্তবাবুদের।

এই ভাঁড় কমরেডরাই ত্রিপুরায় পার্টিকে ডুবিয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের জেলা কমিটিগুলি আলিমুদ্দিনের কর্তাদের খুশি করতে আসল তথ্য গোপন করে মনগড়া রিপোর্ট পাঠিয়ে ছিল। সেই একই ছবি দেখা গিয়েছে আগরতলাতে এবার। ত্রিপুরায় পার্টির মোট আটটি জেলা কমিটি তিন তিনবার রিপোর্ট পাঠিয়ে ছিল যে পার্টির প্রার্থীরা বিপুল ভোটে এবার জিতছেন। জনবিচ্ছিন্ন পার্টি নেতারা আঁচ পাননি যে, ত্রিপুরাজুড়ে বাম বিরোধী ঝড় উঠতে চলেছে। কমরেডদের দাদাগিরি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে ত্রিপুরার মানুষ ক্ষিপ্ত, ভাঁড় কমিউনিস্টরা

গূঢ় পুরুষের কলম

তা বুঝতে পারেনি। মানুষের ক্রোধ এবং প্রতিরোধে শুকনো ঝরা পাতার মতোই বাম প্রার্থীরা ঝড়ে উড়ে গেলেন। অথচ বিপর্যয় যে আসন্ন, সেকথা লিখিত ভাবে জানিয়েছিল সিপিএমের জোট সঙ্গী উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ। ভোটের আগেই পরিষদ রিপোর্ট পাঠিয়েছিল ত্রিপুরায় অন্তত ২০টি আসনে এবং উত্তর ত্রিপুরায় ১৬টি আসনে ধস নামবে বামেদের। জোটসঙ্গীর রিপোর্টকে পাত্তা দেননি মানিক সরকার, বিজন ধরেরা। তাঁরা আস্থা রেখেছিলেন খোসামুদে তল্পিবাহক কমরেডদের উপর। যে কোনও রাজনৈতিক দল যখন আদর্শচ্যুত হয় তখন তার পতনও অনিবার্য হয়।

পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার বাঙালি কমিউনিস্ট নেতারা ভরাডুবির জন্য দায়ী করছেন কেরল লবির নেতা কট্টরপন্থী প্রকাশ কারাতকে। সিপিএম তার একক সাংগঠনিক শক্তিতে বিজেপিকে ভোটে হারাতে পারবে না বুঝেই বঙ্গ এবং ত্রিপুরার নেতারা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়তে চেয়েছিলেন। সীতারাম ইয়েচুরিকে সেনাপতি করে বাঙালি কমিউনিস্টরা কলকাতায় সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বলেছিলেন ত্রিপুরার ভোট শেষ হওয়ার পর জোট ইস্যুতে ভোটাভুটি হবে। কারাত শিবির এই দাবি নাকচ করে দেন। পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের ঝগড়ার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ত্রিপুরার সিপিএম কর্মীদের উপর। বিভ্রান্ত কর্মীরা বসে গেলেন। সারা ত্রিপুরায় বাম দুর্গে ধস নামল আদর্শগত বিভ্রান্তির জন্য। জোট ইস্যুকে কেন্দ্র করে আগামী এপ্রিলে সিপিএম পার্টি কংগ্রেসের বৈঠকে ঝড় উঠবেই। সেই কালবৈশাখীর তীব্র ঝড়ে সিপিএম দুটুকরো হলে অবাক হবো না। একদা চীন ইস্যুতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি দু'টুকরো হয়েছিল। সিপিআই ছেড়ে বেরিয়ে আসা বাঙালি কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় গড়েন সিপিআই (এম)। পরে সিপিআই (এম) ভেঙে চারু মজুমদার-কানু সান্যালরা তৈরি করেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি। সহজ করে বলা হয় নকশাল পার্টি। লেনিনবাদ-স্ট্যালিনবাদকে বহু বছর আগেই খারিজ করে দিয়েছেন রাশিয়ার মানুষ। মাওবাদ আজ অচল মহাচীনে। একমাত্র ভারতেই কিছু লোক তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে মৃত মার্কসবাদকে আঁকড়ে ধরে আছেন। তাই সিপিএম পার্টিটাকে বলা হয় বৃদ্ধদের সাদা চুলের পার্টি। অন্যদিকে, ত্রিপুরার নির্বাচনে বিজেপি টার্গেট করেছিল নতুন প্রজন্মকে। এই প্রজন্ম 'চলো পাল্টাই' স্লোগানকে মন্ত্র করে এগিয়েছিলেন বৃদ্ধতন্ত্রকে সরিয়ে যুবতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়। নবীন প্রজন্ম চাইছে উন্নয়ন। ঝাঁ চকচকে হাইওয়ে। ইন্টারনেট যোগাযোগ। শিল্পে আধুনিকতা, শিক্ষায় প্রসার। সেখানে ত্রিপুরা সিপিএমের বৃদ্ধ নেতারা বাতিল হয়ে যাওয়া আদর্শের লড়াই ছাড়া অন্য বিকল্প দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মম্ভরিতা। তরুণ প্রজন্ম বৃথা তাত্ত্বিক কচকচিতে বিশ্বাস করে না। তারা চায় বাস্তব পরিস্থিতিকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে। মানিক সরকাররা তরুণদের 'মন কি বাত' শোনেন না। বোঝেন না। তাই নিশ্চিহ্ন হওয়াটাই তাঁদের স্বাভাবিক পরিণতি।

সংখ্যাতত্ত্বে পাশ, তবুও আট রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু তকমা পেতে ফেল কেন?

সাধন কুমার পাল

যে সমস্ত রাজ্যে হিন্দু জনসংখ্যা ৫০ শতাংশের কম, সেখানে হিন্দুদের সংখ্যালঘু তকমা দেওয়া যায় কিনা এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের (এন সি এম) ভাইস চেয়ারম্যান জর্জ কুরিয়েনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিটি তৈরি হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর ২০১৭-তে গঠিত এই কমিটিকে তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। এদিকে হিন্দুদের সংখ্যালঘু তকমা নিয়ে শুরু হয়েছে কেন্দ্র-কাশ্মীর নতুন বিবাদ। গত ৯ জানুয়ারি কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেনুগোপাল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর বেঞ্চে অভিযোগ জানালেন, জম্মু-কাশ্মীরে মেহবুবা মুফতি সরকার হিন্দুদের সংখ্যালঘু বলে চিহ্নিত করতে টালবাহানা করছে।

কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেলের অভিযোগ, মুসলমান ছাড়া অন্য জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য জম্মু-কাশ্মীর সরকার সংখ্যালঘু কমিশন তৈরি করবে বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এখন তারা এই বিষয়টি নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। এ ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসন কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকও এড়িয়ে যাচ্ছে। জম্মু-কাশ্মীরে মুসলমানরা কীভাবে সংখ্যালঘুর তকমা পায়, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা ও তাদের চলমান অবস্থা পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্র রাজ্যের যৌথ কমিটি তৈরি হয়। রাজ্য এখন কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না, কেন্দ্রের তরফে এই অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে চার সপ্তাহের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরকে এই বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।

ভারতের সংবিধানে 'মাইনরিটি' শব্দটি বিভিন্ন অনুচ্ছেদে, যেমন অনুচ্ছেদ ২০ থেকে ৩০ এবং ৩৫০এ থেকে ৩৫০বি-তে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মাইনরিটি'দের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সংরক্ষণ-সহ নির্দিষ্ট কিছু অধিকার সুনিশ্চিত করার কথা বলা হলেও সংবিধানে 'মাইনরিটি' শব্দটির কোনও সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। ন্যাশনাল কমিশন অব মাইনরিটি অ্যাক্ট, ১৯৯২-এর ২(সি) ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সম্প্রদায়গুলিই সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত হবে। আইনের এই ধারা অনুসারে ১৯৯৩ সালের ২৩ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ এবং পার্শি এই পাঁচটি সম্প্রদায়কে এবং ২০১৪ সালে জৈন সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরকে এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি জারির পর সুপ্রিম কোর্টের ১১ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত সাংবিধানিক বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিয়েছে সমগ্র দেশ নয়, কেবলমাত্র রাজ্যস্তরের জনসংখ্যাকে একক ধরে নিয়ে ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু চিহ্নিত করতে হবে।

২০১৭ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় আটটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে এই আটটি রাজ্যের মধ্যে লাক্ষাদ্বীপে মুসলমান ৯৭ শতাংশ এবং হিন্দুদের সংখ্যা ২.৮ শতাংশেরও কম, মিজোরামে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৯০ শতাংশেরও বেশি এবং বিভিন্ন জেলায় বৌদ্ধদের উপস্থিতি চোখে পড়লেও হিন্দু ২.৭৫ শতাংশেরও কম। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর ও কোহিমা ছাড়া অন্য কোথাও হিন্দু নেই বললেই চলে। মেঘালয়েও হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। সন্দেহ নেই ভারতবর্ষের এই রাজ্যগুলিতে হিন্দু জনগোষ্ঠী অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগতে থাকা লুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। মণিপুরে হিন্দু জনসংখ্যা ৪১.৩৯ শতাংশ হলেও এই রাজ্যে হিন্দুরা মূলত বিষ্ণুপুর, থুবল, ইম্ফল পশ্চিম ও ইম্ফল পূর্ব এই চারটি জেলার বাসিন্দা। মণিপুরের মতো জম্মু-কাশ্মীরেরও মোট জনসংখ্যার ২৮.৪৪ শতাংশ হিন্দু জম্মুর কয়েকটি জেলার বাসিন্দা এবং কাশ্মীর উপত্যকায় এই সংখ্যা ২.৪১ শতাংশেরও কম। অরুণাচল প্রদেশেও হিন্দু জনসংখ্যা

খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশে এবং শিখ সংখ্যাগরিষ্ঠ পঞ্জাবে প্রকৃত সংখ্যালঘুরা তাদের প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬৮.৩০ শতাংশ) জম্মু-কাশ্মীরে সংখ্যালঘুদের জন্য কেন্দ্র সরকারের বরাদ্দ করা ৭৫৩টি স্কলারশিপের মধ্যে ৭১৭টিই দেওয়া হয় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের।

২৯ শতাংশ। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলির মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের মতো দেশজুড়ে কমপক্ষে এমন ৩০টি জেলা আছে যেখানে জেলাভিত্তিক জনসংখ্যায় সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিজেদের ধন মান সম্পত্তি-সহ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই লড়ছে।

ভারতের এই আটটি রাজ্যে প্রকৃত সংখ্যালঘু হিসেবে হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রাপ্য সংবিধান সম্মত যাবতীয় সুযোগ সুবিধে অনৈতিক ভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষেরা পেয়ে যাচ্ছে। কারণ কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকারই ন্যাশনাল কমিশন অব মাইনরিটি অ্যাক্ট, ১৯৯২-এর ধারা ২(সি) অনুসারে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করেনি। স্বাভাবিক ভাবেই এই রাজ্যগুলিতে প্রকৃত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী সংবিধানের ২৫ থেকে ৩০নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত নিশ্চিত মৌলিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই যুক্তিতে জনস্বার্থ মামলাটিতে দাবি করা হয়েছে, Such a notification is not only "arbitrary, irrational but also invalid and ultra virus the Constitution of India and its basic structure" and must be quashed.

আর্থিক মানদণ্ডকে উপেক্ষা করে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ দেশে ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু চিহ্নিত করে যেভাবে নানারকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তাতে ভারতীয় জনসমাজে বিভেদের চোরাস্রোত প্রবাহিত হয়ে সংবিধানে উল্লেখিত সমানাধিকারের মূলভাবনাটিকে দুর্বল করছে।

লাক্ষাদ্বীপ (৯৬.২০ শতাংশ), জম্মু-কাশ্মীর (৬৮.৩০ শতাংশ) মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গ (২৭.৫ শতাংশ), অসম (৩৪.২০ শতাংশ), উত্তরপ্রদেশ (১৯.৩০ শতাংশ), বিহারের (১৮ শতাংশ) মতো রাজ্যগুলিতেও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না সংখ্যালঘু চিহ্নিতকরণের বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার জন্যই এই সমস্ত রাজ্যে প্রকৃত সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার, সুযোগ সুবিধে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষেরা পেয়ে যাচ্ছে। একইরকম ভাবে খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশে এবং শিখ সংখ্যাগরিষ্ঠ পঞ্জাবে প্রকৃত সংখ্যালঘুরা তাদের প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬৮.৩০ শতাংশ) জম্মু-কাশ্মীরে সংখ্যালঘুদের জন্য কেন্দ্র সরকারের বরাদ্দ করা ৭৫৩টি স্কলারশিপের মধ্যে ৭১৭টিই দেওয়া হয় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের।

আইনানুগ ভাবে রাজ্যস্তরে প্রকৃত সংখ্যালঘু চিহ্নিত না হওয়ার জন্য জনস্বার্থ মামলায় উল্লেখিত আটটি রাজ্য ছাড়াও তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গও ভাষাগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ১৫ দফা কর্মসূচি থেকে শুরু করে রাজ্যস্তরে নানা সুযোগ সুবিধে বিধিসম্মত ভাবে পাওয়ার যোগ্য নয় এমন জনগোষ্ঠীর কাছে চলে যাচ্ছে।

মামলাটিতে সংখ্যালঘু চিহ্নিতকরণের ত্রুটিপূর্ণ ব্যাবস্থার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে প্রকৃত সংখ্যালঘুরা কীভাবে সংবিধান প্রদত্ত বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে, এই বৈষম্যের ফলে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত সংখ্যালঘুদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(১) অনুসারে ধর্ম, জাত, সম্প্রদায়, লিঙ্গ এবং জন্মস্থান নির্বিশেষে সমান সুযোগ সুবিধে পাওয়ার মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। অনুচ্ছেদ ১৬(১) অনুসারে সরকারি সংস্থায় কাজ পাওয়ার সম-অধিকার এবং অনুচ্ছেদ ২৫(১) অনুসারে চিন্তা ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

জনস্বার্থ মামলাটিতে আবেদনকারীর বক্তব্যে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংখ্যালঘু চিহ্নিতকরণের জন্য ১৯৯৩ সালের অযৌক্তিক অসাংবিধানিক কেন্দ্রীয় বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হোক অথবা ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য না করে এই আইন সঠিক ভাবে কার্যকরী করে সংবিধানের মূলগত ভাবনাকে সম্মান দিয়ে রাজ্যভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্ব দেখে হিন্দুদের সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করা হোক। এই মামলা প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বক্তব্য যে, আদালত এ ব্যাপারে কোনও নির্দেশ দিতে বা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এ ব্যাপারে উপযুক্ত সিদ্ধান্তের জন্য, আদালত আবেদনকারীকে বিষয়টি জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনে উত্থাপনের পরামর্শ দিয়েছে।

জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন ও কাশ্মীর-কেন্দ্রের যৌথ কমিটি হিন্দুদের সংখ্যালঘু তকমা নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবে তা অদূর ভবিষ্যতে স্পষ্ট হবে। সন্দেহ নেই বিভিন্ন রাজ্যে প্রকৃত সংখ্যালঘু হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে বছরের বছর ধরে চলে আসা একটি অবিচারের অবসান হবে। তবে বর্তমানে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির পুঁজি হিসেবে, সংখ্যালঘু ইস্যু যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, আর্থিক মানদণ্ডকে উপেক্ষা করে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ দেশে ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু চিহ্নিত করে যেভাবে নানারকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তাতে ভারতীয় জনসমাজে বিভেদের চোরাস্রোত প্রবাহিত হয়ে সংবিধানে উল্লেখিত সমানাধিকারের মূলভাবনাটিকে যে দুর্বল করছে, সেই বিষয়টিও পর্যালোচনার সময় বোধহয় এসে গিয়েছে।

ত্রিপুরা জয়ের মূল কারিগর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

ধর্মানন্দ দেব

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আর এস এস আসলে কী। মূলত সঙ্ঘ তিনটি 'M'-এর উপর দাঁড়িয়ে। তিনটি M হচ্ছে Man Making Machine। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায় যার মধ্যে মান ও হুঁশের সার্থক সমন্বয় দেখা যায়। অর্থাৎ সত্যিকারের মানুষ। শ্রেষ্ঠ মানুষ। এক কথায় বলতে গেলে সঙ্ঘ মানুষ তৈরি করে দেয়। আর সেই মানুষ তাদের ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করে। যার রাজনীতিতে রুচি সে যেমন রাজনীতিতে যায়, আর যার রুচি সমাজ সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার, সে সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। সে অংশগ্রহণ করে সঙ্ঘের সমাজসেবা ভারতীতে। ১৯৭৭ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়তার বোধ জাগানোর জন্য 'বিদ্যাভারতী', ১৯৮১ সালে সংস্কৃত ভাষা প্রচলনের জন্য শুরু হয় 'সংস্কৃত ভারতী'। বনবাসী ও দুর্গম স্থানে সেবা প্রকল্প চালু করা হয় সেবা ভারতী নামে, রাষ্ট্রবাদী চিন্তকদের জন্য প্রজ্ঞাপ্রবাহ, শিখ সমাজে একতা ও সমরসতা স্থাপিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় শিখ সঙ্গত, ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগ, বিজ্ঞান ভারতী, কুটুম্ব প্রবোধন, স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ, গো-সংবর্ধন প্রকল্প, লঘু উদ্যোগ ভারতী, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, বিশ্ব বিভাগ ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এইভাবেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘ তার সমমানসিকতার বিভিন্ন শাখা সংগঠন তৈরি করে রেখেছে, যেখানে স্বয়ংসেবকরা নিজেদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী যোগদান করে। সত্যিই RSS is a man making factory যার Product ভারতমাতার জন্য মরণ-বাঁচন দুইই হাসতে হাসতে করতে পারে এবং সগর্বে বলে, 'হম করে রাষ্ট্র আরাধন, তন মন ধন জীবন সে হম করে

সুনীল দেওধর

রাষ্ট্র আরাধন।'

এখন হয়তো বা অনেক পাঠকের মনে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে যে সঙ্ঘের প্রয়োজন কেন? উত্তরে বলব--- 'ত্রেতায়াশ্চং মন্ত্রশক্তি, জ্ঞানশক্তিঃ কৃতে যুগে। দ্বাপরে যুদ্ধশক্তিশ্চ সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌযুগে।' এখানে সংগঠন শক্তির মূল আধার কেন্দ্রই হয়ে উঠেছে সঙ্ঘ তথা আর এস এস। এখানে সঙ্ঘ আপন করেছে স্বামীজির সেই স্বপ্নকে, যেখানে স্বামীজি বারবার তার গুরুভাইদের উপদেশ দিয়েছেন, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমী যুবকদের নিয়ে দল তৈরি করার। আর সেই উদ্দেশ্যকে যথার্থভাবে রূপায়ণের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন ডাক্তারজি (ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার)।

যাই হোক, এখন মূল আলোচনায় গিয়ে বলতে পারি রীতিমত গণ-অভ্যুত্থানের ধাঁচে বামেদের তথাকথিত শেষ 'দুর্গ' চৌচির হয়ে গেল। শেষ দুর্গ বলায় হয়তো 'বাম' বন্ধুরা অজুহাত তুলে ধরে বলবেন কেরলের কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেখানে নিয়মিতভাবে পালাবদল হয়। যাক, স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল অষ্টমের। ভরাডুবি হলো শাসক দলের। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে একটানা ত্রিপুরায় ক্ষমতায় ছিল সিপিএম। প্রথম ৫ বছর সিপিএমের উপজাতি নেতা দশরথ দেব এবং বাকি ২০ বছর মুখ্যমন্ত্রীর আসনে ছিলেন মানিক সরকার। অন্যদিকে অটুট থেকে যায় পশিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর রেকর্ড। কেননা তিনি টানা ২৩ বছর ৪ মাস ১৬ দিন ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে জ্যোতি বসুর এই রেকর্ড ভাঙতে পারেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যতম সামরিক কৌশলগত রাজ্য সিকিমের এস ডি এফ দলের মুখ্যমন্ত্রী পবন কুমার চামলিং। ইতিমধ্যে তিনি ২৩ বছর আড়াইমাস মুখ্যমন্ত্রী পদে রয়েছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ফের জয়ী হলে রেকর্ড ভেঙে যাওয়া নিশ্চিত।

এখন সবাই আলোচনায় ব্যস্ত কেমন করে বামেদের থাকা একটা শক্ত ঘাঁটি ত্রিপুরা রাজ্যটিও বিজেপি দখল করে নিল। কোনও সন্দেহের অবকাশ না রেখেই উত্তর দেওয়া যেতে পারে একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং স্ট্র্যাটেজির জন্যই বিজেপি আজ এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে। প্রায় ষাটের দশক নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার বাসিন্দা গণেশ দেবশর্মাকে আগরতলায় সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে পাঠানো হয়। তারপর প্রতিবছরই এক বা একাধিক প্রচারককে সঙ্ঘের তরফ থেকে পাঠানো হয় ত্রিপুরা রাজ্যে। ১৯৯৯ সালের ৬ আগস্ট ত্রিপুরা রাজ্যের ধলাই জেলার কাঞ্চনছড়া বনবাসী কল্যাণ আশ্রম থেকে সঙ্ঘের চার কার্যকর্তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এন এল এফ টি জঙ্গি এবং পরে তাঁদের হত্যা করা হয়। এঁরা হলেন শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত, সুধাময় দত্ত, দীনেন্দ্র দে ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী। তখন কিন্তু সঙ্ঘের প্রকাশ্য শাখা ত্রিপুরায় চালু হয়নি। কিন্তু শাখা চালু না হলেও বনবাসীদের জন্য স্কুল-হোস্টেল তৈরি এবং সেবা প্রকল্প চালু হয়ে যায়। আর তখন থেকেই সেগুলোর মাধ্যমে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ সঙ্ঘের সঙ্গে ধীরে ধীরে যুক্ত হতে থাকেন এবং পরে শাখাও

চালু হয়। তবে সেই সময় শাখার সংখ্যা অনেক কম ছিল। আর বর্তমানে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০০-র কাছাকাছি। এছাড়াও বর্তমানে রয়েছে প্রায় ১০টির বেশি হোস্টেল এবং অসংখ্য সেবা প্রকল্প। ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ রেখে বিজেপি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ থেকে আসা ৫২ বছরের সুনীল দেওধরকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। বিজেপির যখন রাষ্ট্রীয় সভাপতি ছিলেন নিতীন গড়করি তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নেতা সুনীল দেওধরকে বিজেপিতে নিয়ে যান। এছাড়াও সুনীল দেওধর ছিলেন সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভরসার লোক। কারণ মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন গুজরাটের দাহোড় জেলায় বিজেপির প্রচারের সম্পূর্ণ ছক সাজিয়ে দিয়েছিলেন এই সুনীল দেওধর। দক্ষিণ দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে দেওধর ঘাঁটি গেঁড়ে বসেছিলেন। আর দিল্লির মসনদে বিজেপি বসতে না পারলেও দক্ষিণ দিল্লির ১০টি আসনের মধ্যে ৭টি বিধানসভা আসনে জয় হাসিল করেছিল বিজেপি। সেটা সম্ভব হয়েছিল দেওধরের জন্যই। এছাড়াও মহারাষ্ট্রের একটিমাত্র আসন সিপিএমের দখলে ছিল। আসনটির নাম হচ্ছে পালঘর। আসনটি ওই রাজ্যের লালদুর্গ বলে বহুল পরিচিত ছিল। ওই আসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দেওধরকে। সেই আসনটিও লালদুর্গ থেকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদী দাঁড়িয়েছিলেন একসঙ্গে দু'টি আসনে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী। সেখানেও প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সুনীল দেওধরকে। আর সেই ব্যক্তির কাঁধে বছর-দুয়েক আগে দায়িত্ব দেওয়া হয় ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের। যদিও সুনীল দেওধরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মেঘালয়ে সঙ্ঘের হয়ে কিছুদিন কাজ করার অভিজ্ঞতাও ছিল। তাই ত্রিপুরার দায়িত্ব পাওয়ার পর বাড়ি ভাড়া করে ত্রিপুরায় একপ্রকার ডেরা বানিয়ে ফেলেন। রাজ্যের আনাচে-কানাচে চষে বেড়াতে থাকেন। ত্রিপুরায় মোট বুথের সংখ্যা ছিল ৩,২৪০টি। প্রতি পাঁচটি বুথের জন্য একজন করে 'শক্তি কেন্দ্র বিস্তারক' নিয়োগ করেন। এছাড়াও নিয়োগ করা হয়েছে ২৫ জন বিস্তারককে শুধু চা বাগান ও অন্যান্য কাজের জন্য। এছাড়াও নিয়োগ করা হয়েছে 'পন্না প্রমুখ' অর্থাৎ ভোটার লিস্টের প্রতিটি পাতার একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। প্রতিটি বুথের ভোটার তালিকায় কম বেশি ১৬ থেকে ১৮ পাতা রয়েছে। প্রতিটি পাতায় প্রায় ৬০ জন করে ভোটার রয়েছেন। আর এই ৬০ জন ভোটার নিয়ে কাজ করতে হয়েছে 'পন্না প্রমুখ'কে। দেশের মধ্যে প্রথম বিজেপি ত্রিপুরায় নিয়োগ করেছে 'ট্রেন সম্পারক'। এদের দায়িত্ব হচ্ছে ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যার কথা জেনে সাধ্যমতো সমাধানের চেষ্টা। শিলচর স্টেশনেও 'স্বাস্থ্য সেবা সদন' নামে যাত্রীদের প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য বুথ খোলা হয়েছিল। এই সদনে মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। সুনীল দেওধর ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে গভীর যোগসূত্র গড়ে তোলেন। এছাড়াও তাদের উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বনবাসী সংগঠন নীরবে কাজ করতে থাকে। এতদিন বামেদের ভরসার আসনগুলি ছিল উপজাতি অধ্যুষিত আসন। কিন্তু এই ২০টি আসনের মধ্যে ১৮টি-তে জয়ী হয়েছে এবারের নির্বাচনে বাম বিরোধী বিজেপি জোট। শুধু জোলাইবারি ও মনু এই ২টি উপজাতি আসনে জয়ী হয়েছে সিপিএম। সুনীল দেওধর শাড়ি পরিহিতা ভারতমাতার পরিবর্তে উপজাতি পোশাকের ভারতমাতার কাটআউট লাগিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরের ধর্মনগর থেকে কৈলাশহর এবং দক্ষিণের বিলোনিয়া পর্যন্ত প্রচারের কাজ করেন। তাই ত্রিপুরার পাহাড় এলাকায়ও সিপিএম ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। ২০টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ভোট হয়েছিল ১৯টি-তে এবং তার মধ্যে ১৭টি পেয়েছে বিজেপি-আই এন টি পি জোট। আই এন পি টি ৯টি আসনে প্রার্থী প্রদান করে ৮টি আসনে জয়লাভ করে। লালদুর্গ নামে পরিচিত খোয়াই জেলায় ৬টি আসনের মধ্যে ৫টি আসনেই বিজেপি জয়লাভ করে। সমগ্র দেশের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেস দল মোট ৫৯টি আসনে প্রার্থী প্রদান করলেও ৫৮টি আসনে জামানত জব্দ হয়েছে। শতাংশের হিসেবে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট হচ্ছে মাত্র ১.৮ শতাংশ। এছাড়াও ত্রিপুরা রাজ্যে নাথ সম্প্রদায়ের ভোটার রয়েছেন প্রায় ২২ শতাংশ। তাদের কাছে টানতে বিজেপি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্য নাথকে নির্বাচনের সময় প্রচারে নিয়ে আসে। ত্রিপুরার ছাত্র ও ভোটার নিয়ে শিলচর ও বেঙ্গালুরুতেও সভা করা হয়। সঙ্গে ছিল নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের স্লোগান এবং অমিত শাহ ও রামমাধবের স্ট্র্যাটেজি। রামমাধব বা অমিত শাহ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে কতটুকু জড়িত ছিলেন তা আর বলার প্রয়োজন নেই। আর তাঁদেরই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বামদুর্গ দখলের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুরের আকরাবানের বাসিন্দা ৪৮ বছর বয়সি বিপ্লব কুমার দেব। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন দিল্লি। সেখানেই যোগ দেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে। সঙ্ঘের বর্ষীয়ান কার্যকর্তা কে এন গোবিন্দাচার্যের অধীনেই সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ নেন। সুনীল দেওধরকে ত্রিপুরার দায়িত্ব প্রদান করে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি ত্রিপুরার ভূমিপুত্র বিপ্লব কুমার দেবকে রাজ্য সভাপতি পদে বসানো হয়। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির এই তরুণ নেতার প্রতি যুবসমাজের নজর ছিল বেশি। এইসব কারণেই ত্রিপুরার মানুষ পদ্মফুলে আকৃষ্ট হন। তাইতো বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ১.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশ। একেবারে নিখুঁত ছক করে ত্রিপুরায় পতন ঘটানো হয় বামদুর্গের। উক্ত আলোচনা থেকে পরিশেষে বলতেই হবে ত্রিপুরা রাজ্যে বাম দুর্গ বিজেপি দখল করার পিছনে মূল কারিগরের ভূমিকা পালন করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘই।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

রাজনীতি যখন অর্থনীতির অনুঘটক

অম্লানকুসুম ঘোষ

রাজনীতির জগতে সীমাবদ্ধ প্রভাবশালী কোনও ঘটনা অনেক সময় অর্থনীতির জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে থাকে। সেরকমই একটি ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে ভারতীয় রাজনীতি-অর্থনীতির জগতে। ত্রিপুরায় এতদিনের বাম দুর্গ

ধরাশায়ী হয়েছে জাতীয়তাবাদী প্লাবনে। নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামও এসেছে জাতীয়তাবাদী দেশভক্ত জোট সরকারের আয়ত্তে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে মাত্র পাঁচটি লোকসভা আসনের দুর্গম কয়েকটি পার্বত্য রাজ্যের শাসনভার পরিবর্তন কী এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ইতিপূর্বেই মণিপুর এবং অরুণাচলপ্রদেশ এসেছে জাতীয়তাবাদী সরকারের সুশাসনের আওতায়। সম্প্রতি অসমে বিজেপির ঐতিহাসিক জয় এবং তার পরবর্তী কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই গোটা দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অর্থাৎ সমস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত এখন জাতীয়তাবাদী শক্তির দখলে। তারপরেও আপাতদৃষ্টিতে একথা মনে হতে পারে যে, সামান্য কয়েকটি লোকসভা আসনের অধিকারী দুর্গম একটি পার্বত্য এলাকার শাসনভার পরিবর্তন ৫৪৩ আসন বিশিষ্ট সমগ্র দেশের নিরিখে কী এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে যে গুরুত্বই থাক না কেন, অর্থনীতির নিরিখে এই ঘটনার গুরুত্ব অপরিসীম।

ভৌগোলিক কারণে উত্তর-পূর্ব ভারত এতদিন ভারতের বাকি অংশের থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল এবং একথা অত্যন্ত দুঃখের হলেও সত্য যে, এই বিচ্ছিন্নতা শুধুমাত্র ভৌগোলিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, অর্থনৈতিক দিক থেকেও উত্তর-পূর্ব ভারত ছিল ভারতের বাকি অংশের থেকে বিচ্ছিন্নপ্রায়। পূর্ব হিমালয়ের ঢাল অংশের অবস্থানের কারণে এখানকার ভূমি অসমতল, কৃষিকার্যের পক্ষে অনুপযুক্ত, তাই এতকাল অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন হয়ে থাকা এই অঞ্চলে জনবসতিও ছিল কম, ফলস্বরূপ জায়গাটি এখনও জঙ্গলাকীর্ণ। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্থানটির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রথমত, জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ার কারণেই স্থানটি নানাধরনের বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে উদ্ভিজ ও প্রাণীজ উভয় প্রকার সম্পদই বিদ্যমান। প্রচুর ভেষজ উদ্ভিদ এই অঞ্চলে সহজপ্রাপ্য। এই সমস্ত ভেষজ উদ্ভিদের সঠিক ব্যবহার দেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থা এবং তৎসংক্রান্ত গবেষণাকে নিয়ে যেতে পারে অনেক উচ্চস্তরে। এছাড়াও ভোট-জোলাকিয়া লঙ্কা, উচ্চমানের কাগজ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বাঁশ ইত্যাদি নানা উদ্ভিজ সম্পদে ভারতের এই অংশটি সমৃদ্ধ। এই সম্পদের সঠিক ব্যবহার দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়কে বাড়িয়ে তুলতে এবং প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি সহজেই দেশ-বিদেশের গবেষক এবং পর্যটক আকর্ষণ করতে সক্ষম। তাদের কেন্দ্র করে দেশের গবেষণা এবং পর্যটনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করা যায় সহজেই। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং অর্থনীতি উভয়ই তাতে উপকৃত হয়। এছাড়াও হিমালয়ের নবীন ভঙ্গিল পর্বতের ঢালে অবস্থিত হওয়ার কারণে এই অঞ্চলটিতে প্রচুর খনিজ পদার্থ থাকারও সম্ভাবনা। সঠিক অনুসন্ধানের অভাবে এই সমস্ত খনিজ পদার্থের উপস্থিতি এতদিন আবিষ্কৃত হয়নি। উপযুক্ত অনুসন্ধান এবং সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এই খনিজ সম্পদসমূহ দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্রের বদল ঘটাতে সক্ষম হবে। এছাড়াও এই স্থানের এক বড় অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক সম্ভাবনা বিদ্যমান। হিমালয়ের পূর্ব-ঢালে অবস্থিত হওয়ার কারণে মৌসুমী বায়ু সর্বপ্রথম ধাক্কা খায় এই অঞ্চলেই। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এইসব এলাকায়। বিশ্বের সর্বাধিক বৃষ্টিবিধৌত এই ঢালু অঞ্চল। তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বর্ণখনিস্বরূপ। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধুমাত্র অরুণাচল প্রদেশেই বছরে এক লক্ষ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। অসম, ত্রিপুরা-সহ অন্যান্য সবকটি রাজ্যের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করলে এই পরিমাণ নিশ্চয়ই কয়েক লক্ষ মেগাওয়াট হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে ক্রমক্ষীয়মাণ খনিজ তেলের ভাণ্ডারের যুগে এই বিপুল পরিমাণ জলবিদ্যুৎ গোটা দেশের ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা পূরণে এবং গোটা দেশকে শিল্পে উন্নত করতে সক্ষম হবে। এছাড়াও বিশ্ব-উষ্ণায়নের ফলে

ক্রমঅপসৃয়মান পানীয় জলের ভাণ্ডারের এই যুগে যখন গোটা বিশ্বে পানীয় জলের ব্যবসা নিযুত ডলারের অঙ্ক ছুঁয়েছে। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই যখন বছরে ১০০০০ কোটি টাকার পানীয় জল বিক্রি হয় (যার বেশিরভাগটাই যায় বিদেশি কোম্পানিগুলির কবজায়)। বিশ্বের তাবড় পরিবেশবিদ এবং অর্থনীতিবিদরা যখন বলছেন যে 'বিংশ শতাব্দী যদি খনিজ তেলের হয়ে থাকে তাহলে একবিংশ শতাব্দী হতে চলেছে পানীয় জলের', তখন ইন্দ্রদেবের কৃপাধন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের মিষ্টি জলের এই অফুরন্ত প্রবাহ দেশের অর্থনীতিকে অন্যভাবে সাহায্য করতে পারে। বৃষ্টি-বাহিত এই বিপুল পরিমাণ পানীয় জলকে পাহাড়ি ঢালের মুখে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম জলাধার স্থাপন করে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করে তার সঠিক প্রক্রিয়াকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণ করার মাধ্যমে প্রচুর কর্মসংস্থান, দেশের টাকার বিদেশগমন (বিদেশি কোম্পানির পানীয় জল কেনার মাধ্যমে) বন্ধ এবং রপ্তানি (পানীয় জল) বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দেশে অর্থনীতির বিকাশসাধন করা যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, জনঘনত্ব কম এবং কৃষিতে পশ্চাদপদ হওয়ার কারণে এই রাজ্যগুলিতে শক্তি উৎপাদনকেন্দ্র, জলাধার এবং শিল্প গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া যাবে সহজেই। জমিজটের কারণে শিল্প ও শক্তি উৎপাদনকেন্দ্র গড়ার যে বাধা আমরা দেখতে পাই আমাদের রাজ্য-সহ বিভিন্ন রাজ্যে, উত্তর-পূর্বের রাজ্যসমূহে সেই অসুবিধার মুখোমুখি হবে না সরকার এবং শিল্পপতিরা। এসব ছাড়াও এই অংশের এক অবস্থানগত সুবিধাও রয়েছে। সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের স্থলপথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হলো দেশের এই উত্তর-পূর্ব অঞ্চল। দেশের একমাত্র এই অঞ্চলের সঙ্গেই মায়ানমারের সরাসরি সীমান্ত বর্তমান। এ ছাড়া আসিয়ান-ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে স্থলপথ যোগাযোগ স্থাপিত হলে পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান সূর্য বলে কথিত দেশ জাপান এবং ইলেকট্রনিক্সের জগতের আর এক মহারথী সদৃশ দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক- বৈদেশিক সম্পর্কও নিবিড়ভাবে হবে। অর্থাৎ চীনের পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক বরাবর অর্ধচন্দ্রাকারে চীনকে বেষ্টন করে নেওয়ার এক মহাসুযোগ থাকবে ভারতের সামনে।

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এত সম্ভাবনাময় যে উত্তর-পূর্ব ভারত তা এতকাল অবহেলিত ছিল কেন? কেনই বা উত্তর-পূর্ব নিজে উন্নয়নের চূড়ায় উঠে গোটা দেশকে উন্নয়নের পথ প্রদর্শন করেনি? এ প্রশ্নের উত্তর কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমত, স্বাধীনতার পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ পাশ্চাত্যপ্রীতি ভারতের বিদেশনীতিকেও করে রেখেছিল পাশ্চাত্যমুখী। তাই পূর্বমুখী অর্থনীতি ছিল অবহেলিত। সে কারণে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিও ছিল অবহেলিত। দ্বিতীয়ত, নিজেদের উন্নাসিক মানসিকতার কারণে ভারতের প্রথম অর্ধশতকের শাসকেরা মনে করতেন জঙ্গলময় পার্বত্য উত্তর- পূর্বের উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রথাগত কৃষি ও শিল্প বাদ দিয়েও যে কোনও রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব তা বোঝার মতো বিশ্লেষণী বুদ্ধি দেশের প্রথম অর্ধশতকের শাসকদের ছিল না। ফলে অন্য পথে উন্নয়নের চেষ্টাও হয়নি। উত্তর-পূর্বের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকায় সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের চেষ্টাও হয়নি। তৃতীয়ত, তৎকালীন ভারতীয় নেতৃত্ব উত্তর-পূর্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও তৎকালীন চীনা এবং পাশ্চাত্য নেতৃত্ব উত্তর-পূর্বের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ছিল সচেতন। তাই দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে ভারত যাতে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ না করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য পাশ্চাত্যের স্বার্থরক্ষী ভ্যাটিকান প্রেরিত খ্রিস্টান মিশনারিরা উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চালিয়ে সেখানে চির অস্থিরতা বজায় রেখেছিল। চীনমোহান্ধ কমিউনিস্টরা ত্রিপুরার শাসক হিসেবে এতকাল তাতে মদত দিয়ে এসেছে। দেশের কাজ করার জন্য যেসব দেশপ্রেমিক তখন ত্রিপুরায় যেতেন উগ্রপন্থীদের হাতে মৃত্যুই ছিল তাদের একমাত্র বিধিলিপি।

এখন কিন্তু এই তিন সমস্যারই সমাধান হয়ে গেছে। প্রথমত, নেহরু আমলের পাশ্চাত্যমুখী চিন্তার ভূতকে ঘাড় থেকে নামিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার 'পুবে তাকাও (Look East)' নীতি নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিশ্লেষণী বুদ্ধিতে উত্তর-পূর্বের গুরুত্ব বোঝা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বের পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছে প্রচুর। তৃতীয়ত, উত্তর-পূর্বের বাকি রাজ্যগুলি আগেই জাতীয়তাবাদী শক্তির দখলে এসেছিল, বাকি ছিল শুধুমাত্র বাম ঘাঁটি ত্রিপুরা। এখন সেটিও জাতীয়তাবাদী শক্তির আওতায়। খ্রিস্টান উগ্রপন্থী আর কমিউনিস্ট শাসক এই অশুভ অক্ষ এখন ভেঙে চুরমার। উত্তর-পূর্বের উন্নয়নের পথে থাকা শেষ বাধাটিও দূর হলো। উত্তর-পূর্বের উন্নয়ন এবং তার মাধ্যমে গোটা দেশের উন্নয়ন এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। তবু একটি বাধা এখনও বর্তমান। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে ভারতের বাকি অংশের যোগসূত্র রক্ষা হয় পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের মাধ্যমে। চিকেন নেক বলে কথিত যে উত্তরবঙ্গের তিনদিকে চীন প্রভাবিত নেপাল ভারতবন্ধু কিন্তু সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল হওয়ায় চীনভীত ভুটান এবং ইসলামিক শাসনাধীন বাংলাদেশের সীমান্ত। সরাসরি সীমান্ত না থাকলেও সীমান্তের কাছেই চীনের অবস্থান এবং রাজ্যের শাসকগোষ্ঠী মুসলমান মৌলবাদীদের দ্বারা চালিত। এই উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গের শাসনাধীন না এলে উত্তর-পূর্বের এবং তৎকেন্দ্রিক সমগ্র ভারতের উন্নয়নের যাবতীয় সম্ভাবনা আকাশকুসুম বলেই প্রতীয়মান হবে। তাই জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থেই ত্রিপুরায় পরে এবার পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতার পরিবর্তন সকলের কাঙ্ক্ষিত। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

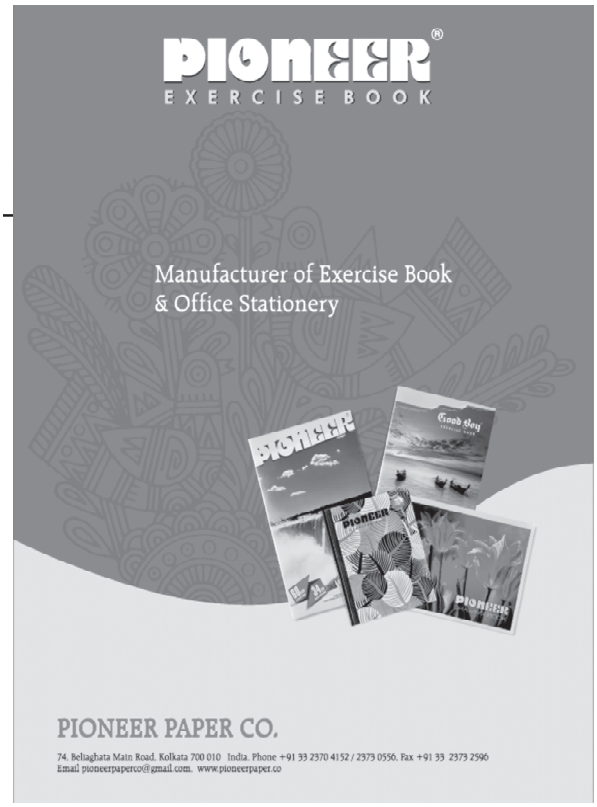

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

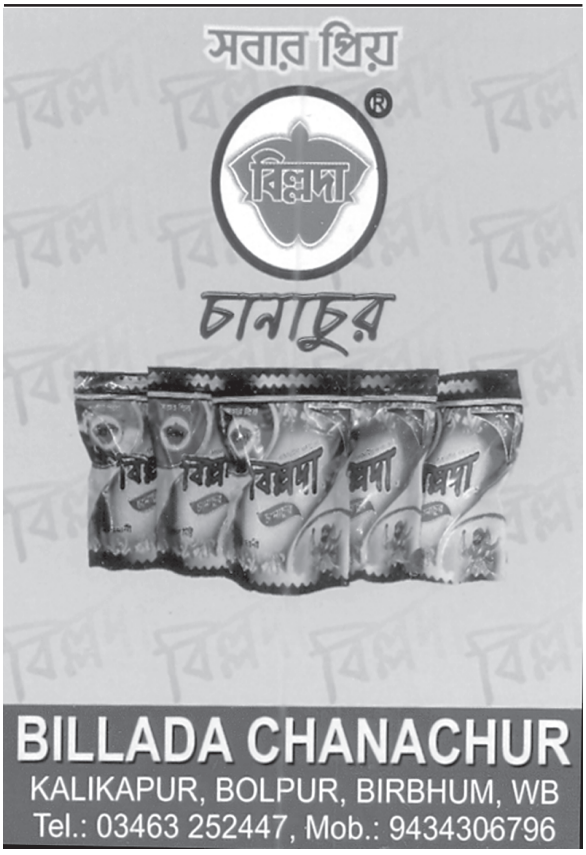

রামমন্দির কবে, জানতে চায় মানুষ

চন্দ্রভানু ঘোষাল।। রামজন্মভূমি আন্দোলনের বয়েস কয়েকশো বছর হয়ে গেল। কিন্তু এখনও এই বিতর্কের মীমাংসা হলো না। আপাতত বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। সম্প্রতি সর্বোচ্চ আদালতের ডিভিসন বেঞ্চ একটি রায়ে বলেছে, 'আদালত এই মামলাকে জমি নিয়ে বিতর্ক হিসেবেই দেখছে। স্বাধীনতার পর থেকে রামমন্দির নিয়ে বহু আবেদন বা পাল্টা আবেদন হয়েছে। কিন্তু আদালত জমিবিতর্কের প্রেক্ষিতেই যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখতে চায়।' এই রায় থেকে স্পষ্ট রামজন্মভূমি এবং রামমন্দির নিয়ে সারা দেশের আবেগ আদালতের কাছে মুখ্য নয়। মামলাটিকে আদালত আর পাঁচটা সাধারণ জমি বিতর্কের মামলার মতোই দেখতে ইচ্ছুক।

যৌথ বেঞ্চের এই রায় নিয়ে নানা মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হলেও একটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অযোধ্যায় যেখানে বাবরি ধাঁচা ছিল সেটাই যে রামজন্মভূমি এবং এককালে সেখানে রামমন্দির ছিল তা প্রমাণ করা মোটেই কঠিন নয়। রামমন্দির ধ্বংস করে জমির প্রকৃত অধিকারীদের উচ্ছেদ করে বাবর ধাঁচা বানিয়েছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এবং প্রাচীন লেখাপত্র থেকে প্রাপ্ত সূত্র বিবেচনা করে জমির প্রকৃত মালিকানার সন্ধানও সম্ভবত কঠিন হবে না।

রামমন্দির কবে তৈরি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে দেশ কতটা অধীর তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে আর্ট অব লিভিং-এর প্রবক্তা শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের মন্তব্যে। একটি ইংরেজি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'অযোধ্যায় রামজন্মভূমির ওপর নির্মিত বাবরি ধাঁচার স্বত্ব নিয়ে মুসলমানরা যে দাবি তুলেছেন তা থেকে তাদের সরে আসা উচিত। অযোধ্যার সঙ্গে ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু হিন্দুধর্মের আছে। আমরা শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান পাল্টাতে পারি না।' রামমন্দির নির্মাণে আদালতের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রামমন্দির সমস্যার দ্রুত সমাধান না করা হলে ভারত অচিরেই সিরিয়ায় পরিণত হবে।' এখানেই না থেমে তিনি বলেন, 'ইসলাম অনুযায়ী কোনও বিতর্কিত জমি বা জায়গায় নমাজ পড়া যায় না। সুতরাং রামজন্মভূমিতে কোনও অবস্থাতেই মসজিদ বানানোর সম্মতি দেওয়া চলে না।' তাঁর কথায়, 'আদালত যদি রামমন্দির নির্মাণে আপত্তি করে তাহলে দেশে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঘৃণা তাতে বাড়বে।'

এদিকে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের দাবিকে মুসলমানরা কী চোখে দেখছেন তার একটা নমুনা পাওয়া গেছে উত্তরপ্রদেশ শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভির কথায়। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'যেসব মুসলমান রামমন্দির নির্মাণের বিরোধী তাদের অবিলম্বে পাকিস্তানে চলে যাওয়া উচিত।' সম্প্রতি ওয়াসিম রিজভি অযোধ্যায় যান এবং মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, 'রামজন্মভূমিতে মন্দির না বানিয়ে যারা বাবরি মসজিদ বানাতে চান ভারতে তাদের কোনও স্থান নেই। তাদের পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে চলে যাওয়া উচিত।' সমাজবাদী পার্টির নেতা আজম খানের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতির প্রসঙ্গও উঠে এসেছে তার কথায়। তিনি বলেন, 'আমি রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে বলেই আজম খান আমার ওপর বিরূপ।' আজম খান এবং কলবে জওয়াদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির জন্য তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রিজভি।

অন্যদিকে অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েসি বালকোচিত অভিযোগ করে বাজার গরম করতে মাঠে নেমে পড়েছেন। ওয়েসির প্রশ্ন, 'আদালতের রায় ওঁদের পক্ষেই যাবে উনি জানলেন কী করে?'

তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের এক বিজেপি নেতা। তিনি বলেন, 'প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক— সব প্রমাণই তো আমাদের পক্ষে। সুতরাং বলতে বাধা কোথায়?'

সুতরাং অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের পথেই এগোচ্ছে সারা দেশ। মন্দির তৈরির জন্য পাথরের কাজও চলছে অনেকদিন ধরে। আদালত রায় ঘোষণা করলেই শুরু হবে নির্মাণ। মুখে সবাই স্বীকার না করলেও মুসলমানরা বুঝতে পারছেন রামমন্দির ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার প্রতীক। এর সঙ্গে ইসলাম বিপন্ন হবার কোনও সম্পর্ক নেই। ■

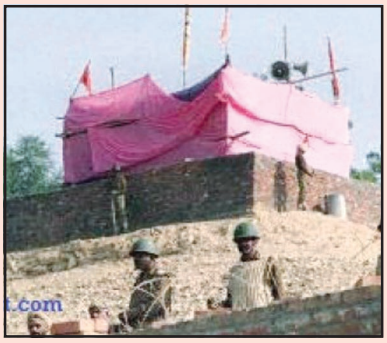

বর্তমানে অযোধ্যার রামমন্দির।

মন্দির তৈরির উদ্দেশে নিরন্তর চলেছে পাথর কাটার কাজ।

প্রস্তুত নক্সাকাটা থাম, মন্দির তৈরির অপেক্ষায়।

‘তুঁহুঁ বিনা জীবন কৈসে সমায়া প্রভু রাম’

ড. তুষারকান্তি ঘোষ

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরাম। তাঁর বেদ সদৃশ জীবন সহস্র বছর ধরে গ্রামীণ প্রান্তর থেকে জনপদ-রাজধানীকে মুখরিত করেছে। বাল্মীকীর ‘রামায়ণ’ রচনার বহু পূর্ব হতেই ‘রামকথা’র আসর মানুষকে হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, বীরত্বের মাধুর্যে উল্লসিত করেছে। ভারতের সভ্যতা শুধু তপোবন-কেন্দ্রিক নয়— এর বাস্তব প্রয়োগ তো গৃহাশ্রমে। পরিবার যেখানে প্রধান। হৃদ-বৃত্তির উজ্জ্বল আলোকে যে প্রেম রচিত হয়, ভক্তিভাব আনে, সেবার মহান আদর্শ এই গৃহাশ্রমের পরিবেশ আনন্দ সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের মনের কূটকৌশলী জাগরণের ক্ষেত্রেও এই গৃহাঙ্গণ— তাই এই সবের উত্তরণ ঘটিয়ে যখন আপামর মানুষ সন্ধ্যার দীপালোকে যে পুরুষোত্তমের জীবনকাহিনি শ্রবণ করে নিজেদের ঋদ্ধ, স্বার্থপর জীবনের সীমা অতিক্রম করে অমৃতের পথের সত্য চিন্তনের বার্তা বাহক হয়ে দাঁড়ায়— সেই জীবন তো পুরুষোত্তম রামচন্দ্রেরই প্রদত্ত। তাই ভারতের ইতিহাসের গতি কালচক্রে পরিবর্তিত হয়— কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের ইতিহাস অবিনশ্বর। শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যেই ভারতবর্ষের সাধনা, ভারতের আরাধনা, ভারতের সংকল্প নিহিত আছে।

বাল্মীকি যুগযুগ ধরে প্রচলিত ভারত-ইতিহাস কাহিনির মধ্য দিয়ে একটি লোকনায়কের সন্ধানে চলেছিলেন— যাঁর জীবন আশ্রিত মহাকাব্য ভারত-আত্মার প্রাণপ্রবাহিনী গঙ্গা স্বরূপিণী হয়ে দেশ বিদেশকে মুক্তির সন্ধান দেবে। কে হবেন সেই প্রার্থিত পুরুষ? ঋষি নারদের কাছে ঋষি কবির প্রশ্ন ছিল—

‘‘সমগ্রা রূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং—
কোনও একটি মাত্র মানুষকেই আশ্রয় করে সকল কিছুই লক্ষ্মীরূপ ধারণ করেছে।’’ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি কবি কি ভারত মহিমার সুগঠনকৌশলী হয়ে চিন্তা করেছিলেন— লক্ষ্মীরূপ এই বিশ্বধারণ করে যখন কৃষির সমৃদ্ধি, শিল্পের বিকাশ, মানবীয় গুণের স্ফূরণ, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে বৃহৎ স্বার্থে উত্তরণ, অকল্যাণকারীর অবসান, এই পৃথিবীর মানুষের কাছে সুমহানগণতন্ত্র, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সর্ব জীবের বিকাশেই তো লক্ষ্মীর স্বরূপ বিভাসিত হবে! বাল্মীকি কি জানতেন না এই রূপ লোকনায়ক শ্রীরামচন্দ্র? তবে নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন? আসলে মহর্ষি নারদ ত্রিকালদর্শী, সর্বত্রই তাঁর বিচরণ। তাই নারদের উপরেই নির্বাচনের ভার দিয়ে বাল্মীকি সর্বজনের স্বীকৃতি আদায় করে নিলেন। মহর্ষি নারদ সেই শ্রেষ্ঠ লোকনায়কের গুণের যে বর্ণনা দিলেন— রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই তা প্রকাশ করি—

‘‘কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে আছে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরাধামে দুঃখ মহত্তম,
কহ মোরে সর্বদর্শী, হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।
নারদ কহিলা ধীরে, অযোধ্যার রঘুপতি রাম।’’

রামায়ণ এই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নয়। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করে মানুষ করেনি, মানুষই নিজের গুণে দেবতা হয়ে উঠেছেন।

মানুষ তো জীবনে উত্তরণের জন্য একটা আদর্শ খোঁজে—তাকেই অনুকরণ করে সে এগোয়। এ কোন রামচন্দ্র? যাঁর ১২ বছর কাটলো তপোবন আশ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থায়, এক বছর ধরে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাক্ষসকুলের সন্ধান ও দমনেই কেটে গেল, আর রাজ্যাভিষেকের দিনেই যেতে হলো চৌদ্দ বছরের বনবাসী জীবনে। ৩২/৩৩ বছরের জীবনে রামচন্দ্রের অরণ্যবাস ঘটল প্রায় সাতাশ বছর। এই দুঃসহ জীবন, জটাবল্কলের বসন, পর্ণকুটিরেই কালক্ষেপণ, বিষম রাক্ষসকুলের নিরন্তর আগ্রাসনের মধ্যে এগিয়ে চললেন শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর যুগযুগান্তরের লোকনায়ক— রাষ্ট্রনায়ক। তাই তাঁর অন্ধ

অনুসরণকারী ভক্ত কুটিরের মধ্যে ক্ষীণ প্রদীপটুকু জ্বালিয়ে আসন্ন রাত্রির তমসাময় রূপে জীবন সঙ্গীত গেয়ে উঠেন— ''তুঁহুঁ বিনা জীবন কৈসে সমায়া, প্রভু রাম''। এই জীবন তো স্বার্থ ত্যাগ করে যাওয়ার জীবন— সেটাও কতখানি সম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রণোদিত মানুষের চাওয়া পাওয়ার নিরিখে। কিন্তু আদর্শবাদী জীবনের সোপান আরোহণকারীদের শাস্ত্র নির্দেশ দিচ্ছে— চেষ্টা করতেই হবে এবং সেই চেষ্টায় রামচন্দ্রই এবং রামচন্দ্রই একমাত্র আদর্শ— 'রামাদিব্য প্রবর্তিতব্যম্'।

রামচন্দ্রের জীবনে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে দুটি প্রবল ক্ষেত্রের সঙ্গে। এক রাষ্ট্রিক, অন্যটি পারিবারিক। ত্রেতাযুগের বহু সংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বজ্র বিদ্যুৎধারী দেবতাদের নিজের প্রাসাদ দ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাঁদের গৃহভৃত্য রূপে ব্যবহার করেছে। এই বিপুল ঐশ্বর্য ও শক্তির অধিকারীর নাম রাবণ। রাবণের অর্থ রবকারয়িতা, আর্তনাদ কারয়িতা।

''যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাৎ ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন ভবিষ্যসি।।''

''হে রাজন, তোমার জন্য এই ত্রিলোক ভীত ও ত্রাহিত্রাহি রবযুক্ত হয়েছে, অতএব তুমি রাবণ নামে প্রসিদ্ধ হবে।''

যিনি রাষ্ট্রনায়কের পদভার গ্রহণ করবেন তাঁকে যে এই ভয়ঙ্কর শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হতে হবে এতো ধ্রুব সত্য। এছাড়া তো পথ নেই।

আর দ্বিতীয়টি পিতা দশরথ। পিতা দশরথের পূর্বকৃত রমণীয় মোহপাশ যে রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকারক— এই সহজ সত্যটাকে রামচন্দ্র বোঝাতে পারেননি। আসলে স্ত্রী বিষয়ক এক অমোঘ মোহ দশরথের ভবিষ্যতকে এমনভাবে মায়াবী ঘেরাটোপে আবদ্ধ রেখেছিল যে পিতা হয়ে প্রিয় পুত্রের অভিষেকের পুণ্যক্ষণে তাঁকে বিসর্জন দিয়েছেন বনবাসে। ফলে রামচন্দ্রকে সমগ্র জীবন ধরেই এর ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে। এই সংঘর্ষ চেতনায় শ্রীরামচন্দ্রকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা দিতে হয়েছে কর্তব্যের, ভ্রাতৃপ্রেমের, পত্নীপ্রেমের ও শক্তির।

অযোধ্যার পরিবার তো প্রীতিনির্ভর , প্রেমনির্ভর, কর্তব্যনির্ভর, সেবা নির্ভর। সেখানে দ্বন্দ্ব নেই, অস্ত্রবিদ্যার পরীক্ষার জটিল রাজনীতি নেই। রাম যেমন ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, তেমনি পিতার সেবায় নিয়ত তৎপর— ধর্নুবেদে চ নিরত পিতৃশুশ্রাষণে রত। অথচ রাজ্যাভিষেকের দিন কৈকেয়ী পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিহিত তরুণ শ্রীরামচন্দ্রকে উপবাসী দেখেও নিশ্চিন্তে বলতে পারলেন— তোমার পিতার ইচ্ছা তুমি এখনই চীরবসন পরিধান করে বনবাসী হও চৌদ্দ বছরের জন্য।'' বিস্মিত শ্রীরাম এতটুকু বিচলিত না হয়েই বললেন—

এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহম্ত্বিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞং প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন।।।

বেশ তাই হোক, পিতার অজ্ঞানুসারে জটা বল্কল পরিধান করে আমি বনবাসে যাচ্ছি। কিন্তু পিতা আমার সঙ্গে কথা বলছেন না কেন? কৈকেয়ী উত্তর করলেন—

''যাবত্তং ন বনং যাতঃ পুরাদ্দস্মাদতিত্বরন।
পিতা তাবন্নতে রাম স্নাশ্যতে ভোক্ষ্যতেহপিবা।।''

তুমি যতক্ষণ না তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বনে যাচ্ছ ততক্ষণ তোমার পিতা স্নান বা ভোজন কিছুই করবেন না।

রামচন্দ্র আর অপেক্ষা করেননি। প্রজারা ক্ষুব্ধ, লক্ষ্মণ ক্রোধে উদ্দীপ্ত তবুও নিশ্চল রামচন্দ্র। ভাই সৌমিত্রকে ডেকে বললেন, ''সৌমিত্রে যোহ অভিষেকার্থে মম সম্ভার সম্ভ্রমঃ। অভিষেক নিবৃত্তিতার্থে সোহস্তু সম্ভার সম্ভ্রমঃ।। —আমার অভিষেকের যে সম্ভার ও আয়োজন সেসব আমার অভিষেক নিবৃত্তির জন্যই আয়োজিত হোক।

পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও কালে ইতিহাসের আলোকে, গতিশীল সমাজ জীবনে বা রাষ্ট্রীয় দর্শনে এমন সুমহান আদেশ কোনও রাষ্ট্রনায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে কি? পিতৃভক্ত, বিষয় নিস্পৃহ শ্রীরামচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিন্তু অটল সঙ্কল্প এই মহাশোক ও ক্রোধের জগৎমঞ্চে এক অসামান্য বৈরাগ্যের মধ্যে বীরত্বের শ্রী উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মধ্যে। এই চরিত্রের বিশিষ্টতায় রামচন্দ্র উজ্জ্বল। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর অরণ্য যাত্রার মমর্ন্তুদ আর্তনাদ আজও প্রতিটি পরিবারে গুঞ্জিত হয়ে উঠে। সকলেই যেন তাঁর যাত্রাপথের সঙ্গী। এক মহান রাষ্ট্রনায়কের অনুসরণকারী বিশাল সমাজও রামচন্দ্রের স্নেহের কিরণালোকে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে। যুগ যুগান্ত ধরে এই যাত্রা চলেছে— আসুরিক শক্তির নিধনের জন্য।

অরণ্যের ঘটনার মধ্যে একটি প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব উঠে আসে। স্বর্ণ-সভ্যতার বলদর্পী শাসককুলের শ্রেষ্ঠ ধুরন্ধর রাবণ সীতাকে গ্রাস করতে চায়। কেন? সীতা লক্ষ্মীশ্রী স্বরূপিণী। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় কৃষির প্রভূত উন্নতি, অরণ্যচারী মানুষের আধ্যাত্মিক জাগরণ, শিল্প সম্পদের সমূহ বিকাশ ও প্রজাদের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রতপস্বীদের হিতার্থবোধ— এই সবই তো ধরিত্রীর পেলবকোমল স্পর্শ সঞ্জাত— সীতা তো হল চালনেরই রেখা। তাই তিনি ভগবতী লক্ষ্মী। তিনিই ধরিত্রীকন্যা- ধরিত্রী লক্ষ্মী। আসুরিক শক্তির প্রেরিত দূত মারীচ। লক্ষ্মীকে বিভ্রান্ত করার কাজের জন্য রাবণ দ্বারা আদিষ্ট। কিন্তু ভোগবাদী সভ্যতার বার্তাবাহক মারীচ নিজেও জানেন এই ভাবে ধরিত্রী লক্ষ্মীকে বশীভূত করা যায় না। সেইজন্য মারীচ রাবণকে সীতাহরণের কাজ হতে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। রামচন্দ্র যে প্রবল শক্তিসম্পন্ন তা মারীচের জানা ছিল। রামচন্দ্রের বিরোধিতার অর্থই ছিল কল্যাণকারী সভ্যতার সংস্পর্শে স্বর্ণসভ্যতার মরীচিকার অবসান— মারীচ তা জানতেন। তাই তিনি রাবণকে নিরস্ত করেছিলেন—

ব্যর্থমানঃ সুবহুনো মারীচেন স রাবণ।
ন বিরোধো বলবত্তাক্ষম রাবণ তেন তে।।''

বলদর্পী রাবণ সে উপদেশ শোনেননি। যার ফল সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়ে উঠে— মৃত্যু তার অনিবার্য পরিণতি, ধ্বংস তার স্বেচ্ছা স্বীকৃত নিয়তির দীর্ঘশ্বাস।

রাষ্ট্রনায়ক যিনি হোন তাঁর লোকসংগ্রহ শক্তি বিপুল রূপ ধারণ করে। নিঃসঙ্গ রামচন্দ্র ও তাঁর অনুজ লক্ষ্মণের হৃদয়ে ছিল মানুষকে আপন করে নেওয়ার শক্তি। অরণ্যচারী সভ্যতারও শ্রীবিবর্ধন আছে। রামচন্দ্র তারই সন্ধানে ছিলেন। তাই যখন সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বললেন—

যত্ত্বমিচ্ছসি সৌহার্দ্যং বানরেণ ময়া সহ।
রাচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিত।।
গৃহ্যতাং পাণিনা পাণিঃ''— যদি আমার মতো বানরের সঙ্গে আপনি বন্ধুত্ব করতে চান আমি আমার হাত এগিয়ে দিলাম, আপনি আমার হাত ধরুন। রামচন্দ্র— ''সংগ্রহষ্টমনা হস্তং পীড়য়ামাম্ পাণিনা 'বানর'

বন্ধুর সঙ্গে রামের বন্ধুত্বের স্বীকৃতি ভারতের কাব্যিক ইতিহাসেই শুধু নয়, সামাজিক ইতিহাসে ভারতবর্ষ যুগ্মের প্রচেষ্টার সর্বত্রকীকরণের রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতা। এ জিনিস শ্রীরামচন্দ্রের নতুন সংযোজন। কারণ ত্রিলোক জয়ী রাবণ কখনও ভাবেনি কিছু বানর সৈন্য তার অহংকারী সভ্যতার স্বর্ণভূমির ভিত্তিকে বিনাশ করতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধ তো বিনাশের জন্যই ছিল। এই অসুরদর্পী মদমত্ততার রণকোলাহল পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের বীর্যের অভিষেকেই সমাপ্ত হয়েছিল। এই যুদ্ধের তুলনা— ''রামরাবণযোযুদ্ধং রামরাবণযোরিব'' —রামরাবণের যুদ্ধ রামরাবণের যুদ্ধের মতোই, এর কোনও উপমা নেই। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে অসুররাক্ষস বিনাশী এই যুদ্ধ চিরন্তন মহিমায় কীর্তিত। একে একে রাবণের সব সেনাপতি— অতিকায়, ত্রিশিরা, নরান্তক, দেবান্তক, মহাপার্শ, মহোদয়, অকম্পন, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ— সকল মহারথীরই মৃত্যু ঘটেছিল।

পুরুষোত্তম রামচন্দ্র রাবণের স্বর্ণসভ্যতার মরীচিকাকে আশ্রয় করে সাম্রাজ্যের মোহজালে আবদ্ধ হননি— জননী জন্মভূমি যে তাঁর কাছে অনেক বড় এই আদর্শ মহাকবিকে দিয়ে তিনি চিরন্তন ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।

অযোধ্যা থেকে রামচন্দ্র যখন অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করছেন, কৌশল্যা রামচন্দ্রকে বললেন— ''তোকে বনে যেতে নিষেধ করার ক্ষমতা আমার নাই, যে ধর্ম আশ্রয় করে বনে যাচ্ছিস সেই ধর্মই তোকে রক্ষা করবে।'' সুমিত্রা লক্ষ্মণকে বলছেন— যে অরণ্যে তোরা থাকবি তাকেই মনে করবি অযোধ্যা, যে বৃক্ষের তলায় বাসা বাঁধবি তাকে মনে করবি রাজপ্রসাদ, রামকে মনে করবি পিতা দশরথ আর আমাকে খুঁজে পাবি সীতার মধ্যে। মাতৃকুলের অভিলষিত আশিস বচনেই ভারতবর্ষ তার পথ খুঁজে পেয়েছে— 'যদীক্ষে তদ বনস্তিমা'— যে দিকে তাকাই মাগো তোমার রূপে আমি মুগ্ধ। মাতৃশক্তির এই জাগরণ ভারতেরই সাধনা।

আর সীতা? রামচন্দ্র ও সীতার প্রেম-অবাধ, অপ্রেমেও সুন্দর। বনযাত্রার কালে সীতা আরও মহীয়সী। অপূর্ব প্রেমের মাহাত্ম্য সূচিত হয়েছে। এত কষ্ট, এত বেদনা, রাক্ষসীদের নিপীড়ন, বন্দিনী সীতার শেষ আশ্বাস— রামচন্দ্র আসবেনই তাঁকে উদ্ধার করতে। রামের আগমন শুধু সীতা উদ্ধারের জন্যই নয়— দুর্বিনীতদের ধ্বংস সাধনের জন্য। সীতা হরণের যে পালা সূচনা করার স্পর্ধা রাবণ দেখিয়েছে সেই সভ্যতার বিনাশ ঘটাতেই তিনি আসবেন। তাই সীতার প্রেম সহস্র সহস্র বছরের সাধনভূমি ভারতবর্ষের একান্ত সম্পদ। আসলে সমগ্র বিশ্বই রাম-সীতার মধুর প্রেমের পূজারী। তাই রাম-সীতার কথা যুগ যুগ ধরে বিশ্বের অসংখ্য জনপদে আজও অনুসৃত হয়ে আসছে— এটাই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষ রামায়ণের দিব্যভূমি। পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের লীলাভূমি। এই ভূমির সাধক-সাধিকারা ভারতের মহতী সমাজ। ■

বনবাসীদের ওপর শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাব

রাম নেই অযোধ্যা আছে। অযোধ্যা আছে সরযূ তীরে এবং মানব হৃদয়ে। এ-কথাটা জলজ্যান্ত সত্য। বাংলা ১৩১৮ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ৮০ বছর আগে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'জাতীয় জীবনে রামায়ণের প্রভাব'। ছোট নাগপুর ও বিহারে ভগবান রাম যে কতো সজীব, তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তিনি সেই প্রবন্ধে। (প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৮)

এ-যুগের কতিপয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবী রামকে উচ্চশ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করে সত্যের বিকৃতি ঘটান, রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বিসর্জন দেন সত্যনিষ্ঠা। অন্যদিকে, যাঁরা সত্যনিষ্ঠ প্রকৃত বুদ্ধিজীবী তাদের ভূষিত হতে হয় সাম্প্রদায়িক অভিধায়। এ-যুগের ক'জন উচ্চবর্ণের হিন্দু রামভক্ত? প্রতিদিন সন্ধ্যায় যাঁরা খোল-করতাল নিয়ে রামকীর্তন করেন তাঁরা তো তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু। তাঁরা খেটে খাওয়া মানুষ, তাঁরা কৃষক শ্রমিক। এমন কি ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে আদিম জনগোষ্ঠী সভ্য শিক্ষিত সমাজের ছোঁয়া বাঁচিয়ে তাঁরাও তো রামভক্ত। এদের অনেকেরই বিশ্বাস তাদের উৎপত্তি রামায়ণের কোনও না কোনও চরিত্র থেকে। কেওনঝারের বনবাসী ভূইঞারা হনুমানকে সূর্যদেবতা হিসেবে পুজো করে। সমগ্র ভারতে জনপ্রিয় গ্রাম্যদেবতা হনুমান। পশ্চিমবঙ্গের ভূইঞারা দাবি করে হনুমান থেকেই তাদের জন্ম। (William Stutterhem– Rama.... Prakasan, New Delhi)

মথুরার সন্নিকটবর্তী কাছওয়াস, লোধা, বুন্দেলখণ্ডের শহরিয়া, গোন্দ, সেঞ্জয়ারি প্রভৃতি জনজাতিরা মহাকাব্যের রামেরই পূজা করে থাকে। (ঐ)

অন্ধ্রের কাপুসা বনবাসীরা মনে করেন রাম সর্বজ্ঞানের আধার। কারণ, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেই তিনি সাধারণ মানুষের হিতের জন্য ধনীদের কাছ থেকে কালোটাকা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। (ঐ)

করনাল জেলার বালু অঞ্চলের বনবাসীদের মধ্যে বাল্মীকি এখনো জীবন্ত। রামকে তারা বলে থাকেন লাল বেল বা নিম্নবর্ণের ঝাড়ুদারদের দেবতা। (ঐ)

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহের বনবাসীদের বিশেষ করে বেহেলিয়া এবং আসেরিয়ারা দাবি করে তারা বাল্মীকির বংশধর। (ঐ)

মহাবীরচরিত এবং ভবভূতির উত্তর রাম-চরিতেও রামকে এমন ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যেন তিনি তাদেরই দেবতা যাদের রয়েছে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক। অর্থাৎ, রাম মাটির কাছাকাছি যারা বাস করে তাদেরই প্রিয় দেবতা।

সুন্দরবনের ওরাঁও জনজাতিদের ঝুমুর গানে রামায়ণের অনেক বিষয়বস্তু টিকে আছে।এরপরও কি এ-সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় যে রাম উচ্চশ্রেণীর প্রতিভূ? এ-কথাটি কি জোর দিয়ে বলা যায় যে, রাম কাল্পনিক এক দেবতা? মাটির মানুষের সঙ্গে যাঁর এতো বেশি সংযোগ তিনি হাওয়ায় ভাসেন কী করে, অর্থাৎ কাল্পনিক চরিত্র হন কী করে?

(পরমেশ চৌধুরীর 'দম্ভী হিন্দু রবীন্দ্রনাথ' থেকে সংকলিত)

রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

দীনেশচন্দ্র সেনের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'রামায়ণী কথা'-র একটি সুদীর্ঘ এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সুদীর্ঘ ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতিতে কেন রামায়ণ অপরিহার্য। রামায়ণকে নিছক মহাকাব্য বলতে রাজি হননি রবীন্দ্রনাথ। বরং, রবীন্দ্রনাথের মতে— রামায়ণ ভারতবর্ষেরই ইতিহাস। রামায়ণী কথা-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন, তার অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হলো।

'আধুনিক কোনও কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিল্টনের প্যারাডাইস্ লস্ট-এর ভাষার গাম্ভীর্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গভীরতা যতই থাক না কেন, তথাপি তাহা দেশের ধন নহে— তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী।'...

'এই জন্যই, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে কিন্তু রামায়ণ- মহাভারতের স্রোত আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে— মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর। ধন্য সেই কবিযুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাঁহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু যাঁহাদের বাণী বহু কোটি নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজস্রধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি-মৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্ত-ভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিতেছে। এমন অবস্থায় রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়-বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে— রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।'...

'স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যত বড় সমালোচকই হই না কেন, একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাস- প্রবাহিত সমস্ত কালের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয়, তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়।'...

'মানুষেরই চরম আদর্শ স্থাপনের জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন এবং সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই আদর্শচরিত বর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছেন।'...

'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।'...

'ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না। ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য, সুবিধার জন্য ছিল না— গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত।... রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমেরই কাব্য।'...

'এই রামায়ণ কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবণিতা আপামর সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইতেছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে, কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য।'...

'রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের কারখানাঘরের বাতায়ন-মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।'

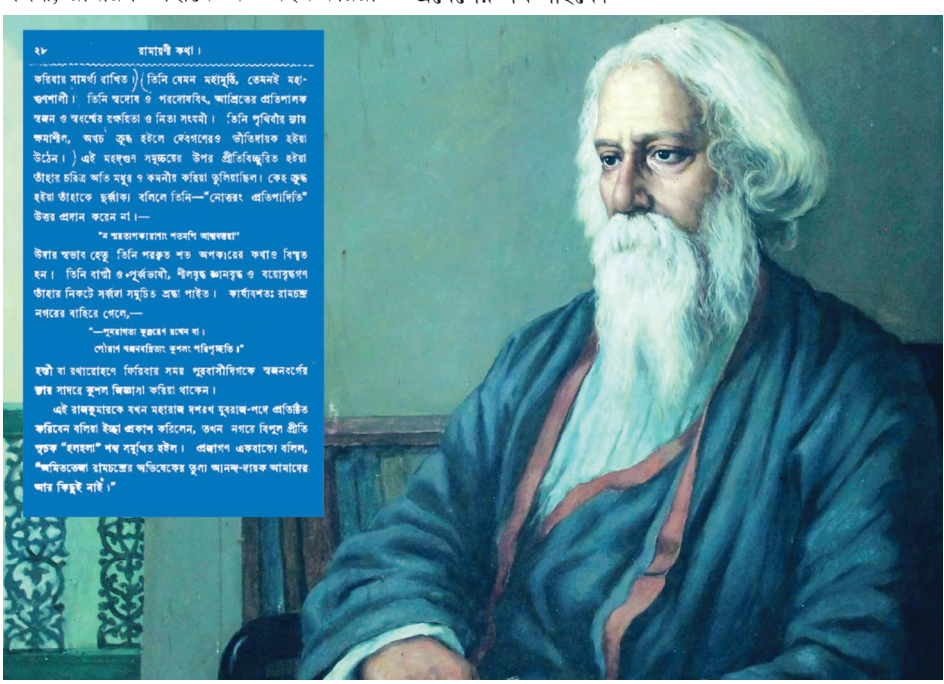

এই সময়

চকচক করলেই...

কোনও জিনিস চকচক করলেই যে সোনা হয় না সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে চীনের এক

চোর। সে একটি দোকানের শোকেসে রাখা কয়েকটা সোনার বার চুরি করেছিল। পরে জানা গেল ওগুলো নকল সোনা দিয়ে তৈরি। সিসিটিভির ফুটেজের সূত্র ধরে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাকে।

দিল্লিতে প্রথম

দিল্লির প্রথম বাইক ট্যাক্সি ড্রাইভারের শিরোপা পেলেন টুম্পা বর্মন। একুশ বছর বয়েসি টুম্পা

তাঁর বাইকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে সারা দিল্লি চষে বেড়ান। ছোটবেলা থেকেই বাইক চালাতে ভালবাসেন। তবে সে সময় শেখার সুযোগ পাননি। শেখার পর বাইক চালানোই পেশা হিসেবে বেছে নেন।

দাড়িতে মানা

স্টাইল করে দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ হলো পাকিস্তানে। পেশোয়ারের সুলেমানি

হেয়ারড্রেসার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শরিফ কাহলু রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন, 'নানারকম ডিজাইনের দাড়ি রাখা ইসলামের সুন্নাহ্‌র বিরোধী।' সুতরাং...!

সমাবেশ -সমাচার

সত্যানন্দ দেবায়তনে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার যাদবপুরে সত্যানন্দ দেবায়তনে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃত ভারতীর সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। মূলত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সমস্ত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী-সহ গবেষক ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি রূপে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তন্ময় ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া শ্রী সত্যানন্দ

দেবায়তনের সভাপতি মৃগানন্দজী মহারাজ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নারায়ণ দাস, সংস্কৃত ভারতীর পবন কুমার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা কাকলী ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

দীপপ্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়, পরে ধ্যেয়মন্ত্র, সংস্কৃতে গান, সুভাষিতম্, শ্লোকপাঠ, শ্রুতিনাটক, বৈদ্য-রোগী সংবাদ, দূরবাণী-বার্তালাপ ও উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভাষণ। অর্চনা পুরী মা সমগ্র অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছেন।

হাওড়া মহানগরে সংস্কৃত সম্মেলন

হাওড়া মহানগরের পক্ষ থেকে গত ফেব্রুয়ারি মাসে হাওড়া গার্লস কলেজের বিপরীতে রাজাগোপাল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃত সম্মেলন। সংস্কৃত ভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ পি নন্দকুমারের বক্তব্য ও সংস্কৃত সম্মেলন সমিতির সভাপতি রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ উপস্থিত সকলের প্রশংসা অর্জন করে। হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের সভাপতি ও সংস্কৃত ভাষার প্রচার প্রসারে তৎপর দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রাস্তাবিক ভাষণে দেবনাগরী ভাষায় শিক্ষা তথা পঠন-পাঠন ও কথাবার্তার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জির পরিচালনায় নৃত্যনাট্য, শ্রুতি নাটক, সমবেত সঙ্গীত ও শ্রীমতী বিউটি কোলের মঞ্চ সঞ্চালনী অনুষ্ঠানটিকে একটি অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ, স্বর্ণিম ফাউন্ডেশন ও কেশব নিবেদিতা সেবা সমিতি সম্মেলনের রূপায়ণে সহযোগিতা করে।

এই সময়

সূর্যে নাম

সূর্যকে স্পর্শ করার নাসার প্রকল্পে আপনিও অংশ নিতে পারেন। না, তার জন্য আপনাকে

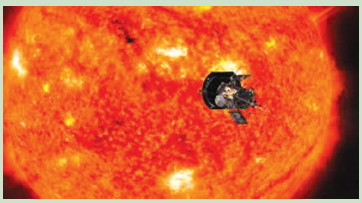

অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে না। স্রেফ আপনার নামটা জানাতে হবে। আগামী জুলাইয়ে নাসার মহাকাশযান পৌঁছে যাবে সূর্যের পরিমণ্ডলে। পৌঁছে দেবে আপনার নামও।

বোতলচিঠি

জাহাজডুবি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এক সময় নাবিকেরা বোতলে চিঠি ভরে সমুদ্রে ভাসিয়ে

দিতেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম বোতল-চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে সম্প্রতি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে। চিঠির বয়েস ১৩২ বছর। আবিষ্কারক টনিয়া ইলম্যান।

হরিয়ানায় বস্তি নয়

হরিয়ানা আর কিছুদিনের মধ্যে বস্তিহীন রাজ্য

হতে চলেছে। হরিয়ানা সরকার একটি পুনর্বাসন নীতি গ্রহণ করেছে। এতে উপকৃত হবেন সেইসব মানুষ যারা শহরাঞ্চলের নানা বস্তিতে বসবাস করেন। সরকার তাদের থাকার জন্য বাড়ি তৈরি করবে।

সমাবেশ -সমাচার

গুয়াহাটিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মঠ-মন্দির বিভাগের বৈঠক

গত ৪ মার্চ অসম রাজ্যের গুয়াহাটি মহানগরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাগৃহে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে মঠ-মন্দির দেবালয়ের পরিচালন সমিতির পদাধিকারীদের এক

চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্মমহামন্ত্রী তথা অখিল ভারত মঠ-মন্দির পর্যবেক্ষক মিলিন্দ পরাণ্ডে। বৈঠকে ১৯টি মঠ-মন্দিরের ৪৬ জন পদাধিকারী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বৈঠকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় ও প্রান্তীয় কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক পরিচালনা করেন উত্তর-পূর্ব প্রান্তীয় মঠ-মন্দির প্রমুখ প্রবোধ মণ্ডল।

শিশুমন্দির ও বিদ্যামন্দিরের প্রাদেশিক ক্রীড়া সমারোহ

শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যে সরস্বতী শিশু মন্দির ও বিদ্যামন্দিরের ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণবঙ্গের ১৩টি জেলার শীর্ষ বাছাই ভাই-বোনেদের নিয়ে প্রাদেশিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান

মেদিনীপুর শহরের শ্রীঅরবিন্দ স্টেডিয়ামে গত ৩-৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী অরবিন্দ স্টেডিয়াম থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগী, স্থানীয় শিশুমন্দিরের ভাই-বোন, আচার্য-আচার্যা, পরিচালন সমিতির সদস্য-সদস্যাবৃন্দ ও জ্ঞানীগুণী জনদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

এই সময়

ভারতীয় ডাক

চলতি বছরের এপ্রিলের মধ্যে ভারতীয় ডাকব্যবস্থার অধীনে ৬৫০টি পেমেন্ট ব্যাঙ্ক

খোলা হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। টেলিকম দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ সিনহা বলেন সারা দেশে ডাকব্যবস্থার নেটওয়ার্ক আরও সুসংবদ্ধ করার জন্যেই এই উদ্যোগ।

অবিবাহিত মহিলাদের পেনশন

আন্তর্জাতিক নারীদিবসের প্রাক্কালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ 'মুখ্যমন্ত্রী

মহিলা কোষ' প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই প্রকল্পে পঞ্চাশোর্ধ অবিবাহিত মহিলারা রাজ্য সরকারের পেনশন পাবেন। এক মহিলা সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী একথা জানান।

প্যাকেজ ২০০০ কোটি

পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে যেসব মানুষ জম্মু ও কাশ্মীরে চলে এসেছেন তাদের জন্য ২০০০

কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করল কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ আহির এই কথা রাজ্যসভায় জানিয়েছেন। ৩৬,৩৮৪টি পরিবারকে ৫.৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে।

সমাবেশ -সমাচার

মেদিনীপুর শহরের মুখ্য পথ পরিক্রমা করে। ক্রীড়া সমারোহে শিশু, কিশোর ও বালক বর্গের প্রায় ৩০০ প্রতিযোগী ১৪টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। মানিকপাড়ার বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীমতী উমা ধর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন ও পতাকা উত্তোলন করেন ক্ষেত্রীয় সভাপতি ড. সাধন মজুমদার। আসন, যোগব্যায়াম, সমবেত সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনআইওএস-এর ডাইরেক্টর শান্তনু সিংহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় ক্রীড়া সদস্য রঘুনাথ সাউ, সংস্কৃত ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক বিজয় গণেশ কুলকার্ণী এবং নয়াগ্রাম পণ্ডিত গভ: কলেজ বালিগোড়িয়ার অধ্যাপক ড. স্বদেশ রঞ্জন পান। এছাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সংগঠন সম্পাদক তারক দাস সরকার, সমন্বয় সমিতির আহ্বায়ক লহর মজুমদার, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক সুব্রত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রথম স্থান অধিকার করে। অনুষ্ঠানে সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন ড. স্বদেশ রঞ্জন পান। সর্বশেষে তিনি সমাপ্তি ভাষণে অংশগ্রহণকারীদের অনেক সম্ভাবনার উল্লেখ করেন ও পরবর্তীকালে প্রয়োজন বোধে উপযুক্ত ট্রেনিং ব্যবস্থাপনার আশ্বাস দেন।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ শাখার যুব মহোৎসব

সম্প্রতি কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত এবং কলকাতার শ্রীশিক্ষায়তন বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই বিদ্যালয়েরই প্রেক্ষাগৃহে যুব মহোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। যুবসমাজের অনুপ্রেরণার আধারস্বরূপ এই মহোৎসবে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বিবেকানন্দ কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সহ-সঞ্চালক নির্মাল্য ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীশিক্ষায়তন ফাউন্ডেশনের সচিব শ্রীমতী ব্রততী ভট্টাচার্য।

উপস্থিত ছিলেন স্কিপার গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সজন কুমার বনশাল। এঁরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, পদস্থ শাখা থেকে আসা বিদ্বজ্জনেরা। সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য এবং উদ্দীপনামূলক ভাষণে জমে উঠেছিল যুব মহোৎসব। বিশিষ্ট অতিথিরা ইয়ুথ ক্যামপেনের বিজয়ীদের এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করেন। সব শেষে 'যুগাবতার বিবেকানন্দ' নামের একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। শুভাঙ্গী উপাধ্যায় এবং বৈদান্তী বিশ্বাস অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

আরোগ্য ভারতীর উদ্যোগে সুস্থ জীবনশৈলী কর্মশালা

গত ২৯ জানুয়ারি আরোগ্য ভারতীর উদ্যোগে কাঁচড়াপাড়ায় ক্ষুদিরাম মঞ্চে 'সুস্থ জীবনশৈলী' বিষয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন আরোগ্য ভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পাদক ডাঃ সুনীল যোশী। অনুষ্ঠানে এলাকার ৩০০ জন বিদগ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন আরোগ্য ভারতীর রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য তপন বৈদ্য এবং দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ প্রমুখ ডাঃ রাজেশ কর্মকার।

উত্তর-পূর্ব ভারতের নির্বাচনী ফলাফল ২০১৯-এর খেলা বদলে দিল

অতিথি কলম

নলিন মেহতা

দিল্লির রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য উত্থান পতনের কাছে কোহিমা, আগরতলা বা শিলং এতটাই দূরের যে প্রায় বিচ্ছিন্ন কোনও অঞ্চল বলে গণ্য হতো। সেখানকার ভোটের কোনও ফলাফল অতীতের নির্বাচনী ইতিহাসে নেহাতই ফুট নোট হিসেবে মান্যতা পেত। ২০১৮ সালের ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া ফলাফল এই সব তুচ্ছ তাচ্ছিল্যকারীদের কাছে বড় ধাক্কা। ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়ে গৈরিক পতাকার উত্তোলন কেবল ঐতিহাসিক কোনও ঘটনা হিসেবেই থেমে না থেকে আমাদের সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীর একটি যথার্থ পরিচায়দায়ক ঘটনা বলেই চিহ্নিত হবে।

রাজনৈতিক দলগুলির কারুর উত্থান কারুর পতন এই সীমিত পরিসরের মধ্যে এই পরিবর্তনকে আবদ্ধ করে রাখার বদলে আমাদের পায়ের নীচের জমিতেই যে এযাবৎ অপরিচিত করে রাখা মানুষজনের মধ্যে নিজেদের পালটে নেওয়ার, পরিবর্তিত হওয়ার যে তাগিদ দেখা যাচ্ছে সেদিকে নজর দিতে হবে। গুজরাটে কিছুটা হলেও কংগ্রেসের পুনরুত্থান, হঠাৎ করে খামখেয়ালি রাহুল গান্ধীর প্রচারের মধ্যমণি হয়ে ওঠা— একই সঙ্গে হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদীর অবিশ্বাস্যভাবে দেশের বিপুল টাকা লুঠ করার অভিঘাতে ২০১৯-এর নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপিকে হয়তো কিছুটা ম্রিয়মাণ করে দিয়েছিল। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না ভারতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শুরুর সেই দিন থেকে লালপন্থী বাম ও গৈরিক দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে যে চিরকালীন আদর্শগত সংগ্রামের কুরুক্ষেত্র সংঘটিত হয়, উত্তরপূর্ব ভারতের এই নির্বাচনী ফলাফল সেই যুদ্ধের রূপরেখা নতুন মাত্রায় নতুন রঙে লিখে দিল।

উত্তর-পূর্বে গৈরিকপন্থীদের ধাক্কা দেওয়ার প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই ক্রিয়াশীল ছিল। বাইরে থেকে যেমনটা মনে হচ্ছে বেশ কিছু সুযোগসন্ধানী দল-বদলুদের একজোট করে হয়তো চোরাবালির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে এই জোট, বাস্তব তা নয়। কয়েক সপ্তাহ আগেও ত্রিপুরায় বিজেপির প্রতিনিধিত্ব করার মতো একজন কাউন্সিলারও ছিলেন না। ২০১৩ সালের বিধানসভায় দল ১.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। আর এতে যে বিধায়ক তৈরি হয় না তা কি আর বলে দিতে হয়! এই শূন্য থেকে শুরু করে ৬০ সদস্যের বিধানসভায় একার দমে ৪৩ শতাংশ ভোট ও ৩৫ জন বিধায়ক জিতিয়ে আনা যে এক অসাধারণ কৃতিত্বের কাজ, বিশেষ করে এমন একটি রাজ্যে যেখানে বিপুল সংখ্যক উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ২০১৩ সালে দিল্লিতে আপ এবং আশির দশকে অন্ধ্রে এন টি আর তাঁর টিডিপি দল করে এমনই এক রূপকথার গল্পের মতো রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু দু'টি দলই ছিল মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু বিজেপি জন্ম থেকেই একটি নির্দিষ্ট আদর্শবাদী দল এবং সদাই আর এস এস-এর মতো সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করে চলে। দেখা যাচ্ছে, শুধু শহরকেন্দ্রিক আগরতলাতেই (কংগ্রেসের গড়) উল্লেখযোগ্য ভালো ফলাফল করা নয়, বিস্তীর্ণ বনভূমি কেন্দ্রিক অর্থাৎ উপজাতি-অধ্যুষিত দক্ষিণ, মধ্য, পূর্ব ত্রিপুরা যেখানে চিরাচরিতভাবে বামেরা শক্তিশালী, সেখানেও দল থাবা বসিয়েছে। জোটসঙ্গী আই টি এফ টি জিতেছে এখানকার ৮টি আসন। এর ফলে পরিষ্কার হয়ে গেছে দল কী বিপুল অগ্রগতি করেছে। নাগাল্যান্ডে আগের ১.৮ শতাংশ থেকে ১৫.৩ শতাংশ ভোট পেয়ে

> "বামপন্থীদের এখন গভীর অস্তিত্ব সংকট। তারা ভাবছে কট্টরবাদী নীতিবাগীশ কমিশনারদের মতানুযায়ী একাই সঙ্ঘ-পরিবারের মোকাবিলায় সক্ষম হবে, নাকি অস্তিত্ব বাঁচাতে কৌশলগতভাবে ২০১৯-এ কংগ্রেসের হাত ধরবে?"

১২টি আসন জেতা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করছে বিজেপিই বিস্তীর্ণ পার্বত্য ভারত ভূখণ্ডেও প্রবল প্রভাবশালী জাতীয় দল হিসেবে উঠে আসছে। নাগাল্যান্ডে এনডিপিপি দলের সঙ্গে কৌশলী জোটের পরিণামে তারা (এনডিপিপি) ১৬টি আসন পেয়েছে।

মেঘালয়ের বিষয়টা সকলের থেকে আলাদা। ১৯৭৬ সাল থেকে কোনও রাজনৈতিক দলই এখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ওই সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন উইলিয়ামসন সাংমা। তিনি দলের একটা অংশকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশিয়ে দেন। এখানেও বিজেপি তার সামান্য ১.৬ শতাংশ ভোটকে এবার ৯.৬ শতাংশে তুলে এনে জিতেছে ২টি আসন। জোটসঙ্গী কনরাড সাংমার এনপিপি দল জিতেছে ১৯টি আসন ও অন্য সঙ্গী ইউডিপি পেয়েছে ৬টি আসন। এর ফলে খেলাটা ৫০-৫০ হয়ে গেছে।

২০১৯-এর জন্য হয়তো নির্দিষ্টভাবে তরুণতম প্রথমবারের ভোটারদের চিহ্নিত করা হবে। সেই প্রচেষ্টায় উত্তর-পুর্বের এই জয় নিশ্চয় সাহায্য করবে। আর বিরোধীদের কাছে আগামী নির্বাচনী লড়াই যেমন নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বা আদর্শের সঙ্গে হবে, তেমনি লড়াই দিতে হবে একটি জয়ের জন্য চির ক্ষুধার্ত রাজনৈতিক কৃৎকৌশলের সঙ্গেও।

কিন্তু ত্রিপুরায় কংগ্রেস যে ১০ থেকে শূন্য এবং নাগাল্যান্ডে ৮ থেকে আক্ষরিক অর্থেই শূন্য হয়ে গেছে এর মধ্যে যে রাজনৈতিক ইঙ্গিত রয়েছে তা কেবল শূন্য হয়ে যাওয়ার চেয়ে অনেক গূঢ়। এই ইঙ্গিত হচ্ছে এখন কংগ্রেসের জায়গায় একমাত্র বিজেপিই দাবি করতে পারে যে, তারা কেবল হিন্দি বলয়ের বা হিন্দুদের দল নয়, তারাই কংগ্রেসের উত্তরাধিকারী। যারা দেশব্যাপী ছড়ানো একমাত্র দল, অন্য সব দল মিলে যাকে হারাতে হবে।

গৈরিক পতাকা ইতিমধ্যেই গুয়াহাটি, ইম্ফল, ইটানগরে উড্ডীয়মান। এবার ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়ের পর পড়ে থাকছে মিজোরাম যেখানে অবশ্য বিজেপি প্রধান দল নয়। আবার বামপন্থীদের সঙ্গে বিজেপির এটিই ছিল প্রথম সম্মুখ সমর। কেরলে বামপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে বাড়তে থাকা মৃতের সংখ্যা যা ইতিমধ্যেই ৯ ছাড়িয়ে যাওয়ায় এই নির্বাচনী লড়াই বাস্তবিক অর্থেই ছিল তীব্র আদর্শগত রক্তক্ষয়ী সংঘাত। জয়ের পর মোক্ষম উত্তর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শব্দ নিয়ে খেলার ছলে 'চোট কা জবাব ভোট' কিংবা 'অস্তগামী সূর্যের রঙ হয় লাল এবং উদীয়মান সূর্য হয় গেরুয়া রঙের।'

বামপন্থীদের এখন গভীর অস্তিত্ব সংকট। তারা ভাবছে কট্টরবাদী নীতিবাগীশ কমিশনারদের মতানুযায়ী একাই সঙ্ঘ-পরিবারের মোকাবিলায় সক্ষম হবে, নাকি অস্তিত্ব বাঁচাতে কৌশলগতভাবে ২০১৯-এ কংগ্রেসের হাত ধরবে? এই নির্বাচনে কংগ্রেসের জন্যও নীতি শিক্ষা আছে। কেবলমাত্র মজবুত প্রাদেশিক নেতৃত্ব থাকলে (যেমন পঞ্জাবে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহ) বা বিপুল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা থাকলে তবেই তাদের সেখানে জেতার কোনও সম্ভাবনা থাকতে পারে। গুজরাটে যেটুকু উৎসাহ রাহুল সংগ্রহ করেছিলেন উত্তর-পূর্ব তার অনেকটাই কেড়ে নিল। এখন রাজনীতির যে সূক্ষ্ম খেলার ইঙ্গিত মেঘালয়ের ত্রিশঙ্কু বিধানসভায় দেখা যাচ্ছে সেখানে কংগ্রেস কে পাল্লা দিয়ে গোয়ার অবস্থা হয়েছে। এদিকে বিজেপি তাদের পাল খাটানো নৌকায় বাড়তি হাওয়ার উজানে কর্ণাটকে চলেছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে মোট ২৫টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২০১৪-তে বিজেপি ১০টি জিতেছিল। দল ইতিমধ্যেই চিন্তা করেছে পশ্চিম ভারতের রাজস্থান বা কিছু রাজ্যে যে সংখ্যায় আসন কমতে পারে সেই ঘাটতি এখানেই পুষিয়ে নেবে। গুজরাটে পর পর নির্বাচন জেতার পেছনে মোদীর কৌশল ছিল প্রত্যেকবারই নতুন ধরনের কিছু ভোটারকে টার্গেট করা। কোনও সময় বয়স্কদের থেকে মহিলাদের মন পেতে বেশি চেষ্টা করা হলো, কেননা বড়রা তো চলেই এসেছেন। ২০১৯-এর জন্য হয়তো নির্দিষ্টভাবে তরুণতম প্রথমবারের ভোটারদের চিহ্নিত করা হবে সেই প্রচেষ্টায় উত্তর-পুর্বের এই জয় নিশ্চয় সাহায্য করবে। আর বিরোধীদের কাছে আগামী নির্বাচনী লড়াই যেমন নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বা আদর্শের সঙ্গে হবে, তেমনি লড়াই দিতে হবে একটি জয়ের জন্য চির ক্ষুধার্ত রাজনৈতিক কৃৎকৌশলের সঙ্গেও। ■

ত্রিপুরায় পদ্মের সুনামিতে ধরাশায়ী পরিবর্তনের কাণ্ডারিরা

প্রথমবারের মতো বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিজেপি ত্রিপুরায় ইতিহাস গড়ল। পরিবর্তনের ঝড়ে থমকে গেল প্রত্যাবর্তনের আওয়াজ। প্রত্যাবর্তনের দাবিদার বামফ্রন্ট কোনওক্রমে ১৬টি আসন পেয়ে মান রক্ষা করতে পারলেও বিধানসভায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বামফ্রন্টের জোট শরিক আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও সিপিআই। শরিকদের জন্য এবারের নির্বাচনে তিনটি আসন বরাদ্দ ছিল, কিন্তু একটি আসনেও তারা জয়লাভ করতে পারেনি। পরিবর্তনের ডাক দিয়ে বিজেপি-আই পি এফ টি (ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা) জোট বাজিমাত করে দিয়েছে। পঁচিশ বছরের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টকে ধরাশায়ী করে এই প্রথম বিধানসভায় প্রবেশের ছাড়পত্র পেল বিজেপি। গত নির্বাচনে বিরোধী দল কংগ্রেসের জোট সঙ্গী ছিল আই এন পি টি। এবার কোনও দলের সঙ্গে কংগ্রেস নির্বাচনী সমঝোতায় না গিয়ে একক ভাবে প্রার্থী দিয়েছিল, কিন্তু ২০১৩ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস নয়টি আসন পেলেও এবার তারা একটি আসনেও জিততে পারেনি। সবকটি আসনে পরাজিত হয়েছে। ফলে বিধানসভায় বিরোধী দলেরও মর্যাদা পায়নি। তার স্থানে ১৬টি আসন পেয়ে বিরোধী দলের মর্যাদা দখল করে নিল সিপিএম। বিজেপি পেয়েছে ৪৩ শতাংশ ভোট। সিপিএম পেয়েছে ৪২.৬ শতাংশ ভোট। অপরদিকে কংগ্রেস পেয়েছে ১.৮ শতাংশ ভোট। আই পি এফ টি, সিপিআই, আরএসপি, আই এন টি পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, তৃণমূল কংগ্রেসের ৭.৫ শতাংশ, ০.৮ শতাংশ, ০.৮ শতাংশ, ০.৭ শতাংশ, ০.৬ শতাংশ এবং ০.৩ শতাংশ। বামফ্রন্ট, বিজেপি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়াও বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দলও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল। যদিও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে বামফ্রন্ট বনাম বিজেপি-আই পি এফ টি জোটের মধ্যে।

নির্বাচন কীভাবে করাতে হয় বিজেপি তা দেখিয়ে দিয়েছে। ২৫ বছর ধরে বিরোধী দলে থেকে কংগ্রেস যা করে দেখাতে পারেনি, বিজেপি তা করে দেখিয়েছে। যার ফলে পদ্মের সুনামিতে ধরাশায়ী হলো প্রত্যাবর্তনের কাণ্ডারিরা।

—গৌতম দত্ত,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

গুলাম নবি আজাদের হুঙ্কার

২৫ ফেব্রুয়ারি অসমের হাইলাকান্দিতে এক জনসভায় প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেসের গুলাম নবি আজাদ বলেছেন— 'মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করতে তালাক ইস্যু সরকারের।' এরজন্য তিনি দাবি করেছেন, 'ধর্মীয় বিধানে আঘাত করে তিন তালাক ইস্যু নিয়ে সরকারের আনা বিল রাজ্যসভায় আটকে রাখতে সমর্থ হয়েছি। এনিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ দীর্ঘ সোয়া এক ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেও বিল আনার পক্ষে রাজি হইনি। পবিত্র কোরানে বেঁধে দেওয়া ধর্মীয় বিধানই সর্বোত্তম বিধান। ধর্মীয় এ বিধানের উপর আঘাত হানা কোনও অবস্থায় বরদাস্ত করা যাবে না।' তিনি আরও বলেন, 'পবিত্র কোরানে পরিষ্কার বিধান বেঁধে দেওয়া আছে, যে কেউ যদি তাঁর স্ত্রীকে 'মা' বলে ডাকেন তাহলে তাঁর বিবি তালাক হয়ে যায়। তাই মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করতেই এহেন তালাক প্রথার বিরুদ্ধে বিল আনা সরকারের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

তিন তালাক শীর্ষ আদালতের রায়ে অবৈধ ঘোষণার পরও এ নিয়ে নতুন আইন করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সাহিত্যিক আবুল বাশারও সংবাদমাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যদিও ওই রায়েরই এক অংশে সরকারকে এ ব্যাপারে ছ'মাসের মধ্যে আইন প্রণয়ন করতে বলা হয়েছিল। শীর্ষ আদালতের রায়েও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে এ

ব্যাপারটা দলীয় রাজনৈতিক লাভালাভের প্রশ্ন ব্যতিরেকেই বিবেচনার আশা করা হয়েছিল। কিন্তু এ পোড়া দেশে যদিও তা বাস্তবে হয়নি। উল্লেখ্য, বাশারের মতে কোরানে তিন তালাকের বিধান নেই, কিন্তু কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ মনে করেন যে, পবিত্র কোরানে তালাকের বিধান আছে এবং সেই বিধান সর্বোত্তম বিধান। সেজন্য ধর্মীয় এ বিধানের উপর আঘাত হানা বরদাস্ত করা হবে না বলে তিনি হুঙ্কার ছেড়েছেন। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, গুলাম নবি আজাদ বা আরও কিছু মুসলমান নেতা কি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি একবিংশ শতকেও শরিয়ত আইনের মধ্যেই বন্দি রেখে শুধু বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করে যাবেন? বিশ্বের অন্য মুসলমান রাষ্ট্রের দিকে চেয়ে দেখবেন না? সৌদি আরব মুসলমানদের কাছে পবিত্রতম দেশ। প্রতি বছর ভারত থেকে লক্ষাধিক এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকেও লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সৌদি আরবে হজযাত্রায় যান। সেই সৌদি আরব-সহ বিশ্বের প্রায় ৫৭টি মুসলমান দেশের মধ্যে আরব-সহ ২৩টি মুসলমান দেশের সরকার তিন তালাক বন্ধ করে দিয়েছে। ওই দেশগুলির মধ্যে আছে ভারতের পড়শি দেশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি।

—মণীন্দ্রনাথ সাহা,
গাজোল, মালদহ।

খুনির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

সংবাদে প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জঙ্গল মহলের ৩৫৫ জন সাবেক মাওবাদীকে নিয়ে বৈঠক করেছেন। এদের মধ্যে, পুলিশ অফিসার পার্থ বিশ্বাস এবং তার বন্ধু সৌম্যজিৎ বসুর খুনের আসামি

জাগরী বাস্কেকেও দেখলাম। এখানে উল্লেখ্য যে ২০১০-এর অক্টোবরে অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে মাওবাদীদের হাতে এরা দুজন খুন হন। সেই খুনিকে শাস্তি না দিয়ে তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক আমার চোখে কেমন একটা বেমানান ঘটনা মনে হচ্ছে। ভারতীয় সংবিধানে এমন কোনও ধারা আছে যে, মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করলেই একজন খুনিকে রেহাই দিতে পারেন? এই সম্পর্কে ২০.১১.২০১১ তারিখের এক পত্রিকায় সৌম্যজিৎ বসুর স্ত্রী স্বচ্ছতোয়া বসু এবং পার্থ বিশ্বাসের স্ত্রী বর্ণালি বিশ্বাসের যে বিবৃতি ছাপা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

স্বচ্ছতোয়া বসু— 'কী করে এমন কাজ করল জাগরী। ২৫.৫.১১ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার আর্জি জানিয়ে এসেছি। ছ' মাসেও ডাক পাইনি। আমাদের ভোটে জিতে উনি (মমতা) আজ মুখ্যমন্ত্রী, অথচ আমরাই ব্রাত্য হয়ে গেলাম।' পার্থ বিশ্বাসের স্ত্রী বর্ণালি বিশ্বাস জাগরীর আত্মসমর্পণ এবং মহাকরণের অলিন্দে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি দেখে বলেন--- 'অনেককে বিশ্বাস করেছি, এখন আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।' সৌম্যজিতের মা সুমিত্রা বসু বলেন— গত তিন দিন ধরে খবরের কাগজ পড়ে, টেলিভিশন দেখে জানতে পেরেছেন তাঁর ছেলে সৌম্যজিৎ-এর হত্যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জাগরীর নাম। 'ওর তো চার বছরের ছেলে রয়েছে। আমার ছেলেকে মারার সময় ওর হাত এক বারের জন্যও কাঁপেনি?'

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা তলানিতে

পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা ইদানীং একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। প্রতিদিন রাজনৈতিক খুনোখুনি, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, আত্মহত্যা, বধূহত্যা, পণের বলি, অপহরণ, লাভ জেহাদ, মার-দাঙ্গা, খুন, তোলাবাজি, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সিন্ডিকেট ব্যবসা, শাসকদলের অবাধ দৌরাত্ম্য ইত্যাদি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অপরাধ সংঘটিত হয়ে চলেছে। ফলে এরাজ্যে দেখা দিয়েছে নৈরাজ্য, স্বৈরাচারিতা, একনায়কতন্ত্র তথা জঙ্গলের রাজত্ব। এছাড়াও রয়েছে ব্যাপক মুসলমান অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, গোপাচার, নারী পাচার, দুর্নীতি, ইসলামিক সন্ত্রাস, জঙ্গিদের গোপন ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি। তাই পশ্চিমবঙ্গ আজ দাঙ্গাবাজ, দুর্নীতিবাজ, সমাজবিরোধী ও দেশদ্রোহিদের 'অভয়ারণ্যে' হয়েছে পরিণত। তবে এরাজ্যের সার্বিক অধঃপতন যে এই রাজত্বেই শুরু হয়েছে তা নয়। অধঃপতনের শুরু ৩৪ বছরের বাম-রাজত্বে। আর এই অবক্ষয়ের পথপ্রদর্শক বামেরাই। কিন্তু তৃণমূল-রাজত্বের অধঃপতন বামরাজত্বকেও ছাড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। 'দিদি'র আস্কারা, আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে তাঁর 'ভাই'য়েরা আজ বেপরোয়া-অপ্রতিরোধ্য। তাদের 'সাত খুন মাফ'। তাই পুলিশ তথা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা 'ভাই'দের অসামাজিক, অনৈতিক, বেআইনি বা অপরাধমূলক কাজকর্ম দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। কারণ তারা যে চোখে পরেছে ঠুলি আর কানে দিয়েছে তুলো। শাসকদলের খাতায় নাম থাকলেই হলো। আর তাহলেই পোয়াবারো। লুটেপুটে খাও। পুলিশ-প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ। কারণ ওরা যে 'দিদি'র আদরের 'ভাই'। শাসক দলের আশ্রিত ও মদতপুষ্ট সমাজবিরোধী দুষ্কৃতীরা বেআইনি ভাবে এবং পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে বালির খাদান, পাথরের খাদান ও কয়লার খাদান থেকে তুলছে বালি, পাথর ও কয়লা। আর সেগুলি বিক্রি করে লুটছে কালোটাকা। পুলিশ-প্রশাসন সব জানে। কিন্তু চুপ। উল্টে পুলিশ রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে লরিওয়ালাদের কাছ থেকে তুলছে তোলা। শোনা যায়, অবৈধভাবে বালি, পাথর, কয়লা বিক্রির টাকার একটা অংশ নাকি চলে যাচ্ছে শাসকদল ও প্রশাসনের হোমরাচোমরাদের পকেটে।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

ল্যান্ড জেহাদ

মালদহ জেলা-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে লাভ জেহাদের সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্ড জেহাদের ঘটনা বেড়ে চলেছে। সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে এইসব ঘটনাতে প্রশাসন মুসলমানদের সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় শ্মশান, মন্দির ও সরকারি জমি তারা দখল করে চলেছে।

মালদহ জেলার রতুয়ার বৈকুণ্ঠপুর ঘোষপাড়ার রানা সাহা বাড়িতে মাটির মূর্তি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার সঙ্গে থাকতেন তাঁর ভাই ধ্রুব সাহা। পাশের গ্রাম হরগোবিন্দপুরের সাহাবুদ্দিন বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে ধ্রুব সাহার বাড়িটি কেনার জন্য বায়না দেন ও পরে সেই জমি কিনে নেন। দাদা রানা সাহা কোর্টে কেস করলে আদালত স্ট্যাটাস-কো আদেশ দেন। কিন্তু সাহাবুদ্দিন তার দলবল নিয়ে কোর্টের আদেশ অমান্য করে পুলিশের সাহায্য নিয়ে রানা সাহার বাড়িতে চড়াও হয়ে জানালা দরজা ভেঙে তছনছ করে। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে কিছুদিন অত্যাচার বন্ধ থাকলেও গত বছর বেশ কয়েকবার বাড়িটিতে পরপর ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রতুয়া থানা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। গত ২৮ জানুয়ারি পুনরায় সাহাবুদ্দিন লোকজন নিয়ে রানা সাহার বাড়ি আক্রমণ করে ও তাকে মাটিতে ফেলে মারতে থাকে। ভাগ্নী দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী রীনা সাহা মামাকে বাঁচাতে এলে তাঁকেও মারধর ও শ্লীলতাহানি করা হয়। এর পরের ঘটনা অভাবনীয়। রতুয়া থানা কর্তৃপক্ষ উল্টে রানা সাহা ও তারা ভাগ্নীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়। তাদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬, ২০৭, ৩৪১ ও ৩৪ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বাড়িটিতে অবৈধ নির্মাণ কাজ চলছে কোর্টের স্থিতিশীল বা স্ট্যাটাস কো আদেশ থাকা সত্ত্বেও। পুলিশ প্রশাসনের অসহযোগিতায় রানা সাহার ভাগ্নে পিন্টু রজক প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল-ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুবিচারের জন্য আবেদন করেছেন। ডি এম, এস পি-র কাছে আবেদন করেও কোনও সুবিচার পাননি। এই পরিবারের অসহায় অবস্থার কথা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়া জনসমক্ষে তুলে ধরেনি।

—তরুণ কুমার পণ্ডিত,
কাঞ্চনতার, মালদহ।

পরম্পরা

শ্রীরাম ঐতিহাসিক চরিত্র প্রমাণ দিতে পারে রামসেতু

সন্দীপ চক্রবর্তী

সম্প্রতি একটি অ্যামেরিকান চ্যানেল রামসেতু নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। চ্যানেলটি বিজ্ঞান গবেষণামূলক। হোয়াট অন আর্থ নামক একটি টিভি শোয়ের প্রোমোতে চ্যানেলের পক্ষ থেকে এক গবেষক জানিয়েছেন, ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে যে সেতুর অস্তিত্ব হাজার হাজার বছর ধরে বিদ্যমান সেটি সম্ভবত মানুষের তৈরি। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে এমন কিছু তথ্য মিলেছে যার ভিত্তিতে তাঁর এই স্বীকারোক্তি। তিনি বলেন, 'বালির ওপর যেসব পাথর পাওয়া গেছে তাদের বয়েস বালির থেকেও বেশি।' অর্থাৎ পাথর আগে থেকেই ছিল, বালি পরে এসেছে।

রামায়ণ অনুযায়ী রামসেতু রাম তৈরি করেছিলেন। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন হনুমান, জাম্বুবান, নল নীল-সহ কয়েক লক্ষ বানরসেনা। বর্তমানে সেতুটির কিছু অংশ ভারতের পাম্বান দ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কার মান্নান দ্বীপের মধ্যে রয়েছে। উল্লেখ্য, মান্নান দ্বীপ সম্পূর্ণতই মানুষের তৈরি। গবেষকদের মতে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে বালি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে পাথর বালির ওপর পাওয়া গেছে তা দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে থাকার কথা নয়। সম্ভবত এই পাথর অন্য কোনও জায়গা থেকে আনা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। রামসেতুকে অনেকে অ্যাডামস ব্রিজ বলে থাকেন। সম্প্রতি হিন্দুস্থান টাইমসে প্রকাশিত একটি লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, অ্যাডামস ব্রিজ চূণাপাথর দিয়ে তৈরি। একে চড়াও বলা যেতে পারে। মান্নার উপসাগরের দুই প্রান্তে ভারত এবং শ্রীলঙ্কাকে সংযুক্ত করেছে এই ব্রিজ।

রামসেতু নিয়ে ভারতের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস স্পষ্টতই দ্বিধাবিভক্ত। এক পক্ষ বলছে হিমযুগের সময় ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে স্থলপথে যোগাযোগ ছিল। অন্যপক্ষের মতে যোগাযোগ থাকবে না কেন, তখন শ্রীলঙ্কা তো ভারতীয় উপমহাদেশেরই (মেইনল্যান্ড) অঙ্গ ছিল। অন্যদিকে হিন্দু পুরাণের বক্তব্য, সীতাকে রাবণের বন্দিশালা থেকে মুক্ত করার জন্য রাম বানরসেনার সাহায্যে সেতু নির্মাণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউপিএ আমলে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া একটি এফিডেভিটের মাধ্যমে আদালতকে জানিয়েছিল, রামের কোনও অস্তিত্ব নেই। অন্তত ঐতিহাসিক কোনও তথ্যের সাহায্যে তা প্রমাণ করা যায় না। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠায়, পরে বিবৃতি পালটে বলে রামের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া গেলেও, তিনি যে সেতু নির্মাণ করেছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই। এখন প্রশ্ন হলো, বিজ্ঞান গবেষণা চ্যানেলের নতুন পর্যবেক্ষণে কি রামের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব? যদিও গবেষকেরা রামের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে কিছু বলেননি, কিন্তু এই নিবন্ধে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য আলোচনা করা যেতে পারে।

রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে রামসেতু নির্মাণের ঘটনা। মানতেই হবে বর্ণনাটি অতিপ্রাকৃত। মনে হতে পারে জোর করে রামকে ভগবান বানানোর জন্য এবং সেই সময়কার পরিবেশকে একটা আধিদৈবিক মোড়ক দেবার জন্য এমন একটি বর্ণনা করা হয়েছে। যাই হোক, ঘটনাটি এইরকম : সীতাকে উদ্ধারের জন্য সাগর পেরিয়ে ওপারে লঙ্কায় যাওয়া দরকার। কিন্তু কীভাবে যাবেন রাম? অগ্নিবাণের সাহায্যে সাগর জলশূন্য করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। যারপরনাই উদ্বেগে-দুশ্চিন্তায় সময় বয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় সমুদ্রদেব জলের গভীর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার বাহিনীতেই নল নামের এক বানর আছে। সে বিশ্বকর্মার পুত্র। পিতার কাছেই সে শিখেছে স্থাপত্যবিদ্যা। তাকে বলুন পারাপারের জন্য একটা সেতু নির্মাণ করে দিক। কথা দিচ্ছি, আমি সেই সেতু ধরে

রাখব।'

এরপর শুরু হলো সেতু নির্মাণ। অসংখ্য তাল ডালিম নারকেল বিভীতক কারিয়া বকুল এবং নিমগাছ কাটা হলো। বিশালাকৃতি বানরেরা হাতির সমান পাথর নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এক ধারে জড়ো করে ফেলল। এদিকে অত বড়ো বড়ো পাথর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সমুদ্রের জল তখন ফুঁসে উঠেছে। চতুর্দিক থেকে তখন পাথর পড়ছে। পাথরগুলিকে এক লাইনে রাখার জন্য কেউ কেউ দড়ি ধরে আছে।

নলের নকশা অনুযায়ী সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে সেতু নির্মাণ করা হচ্ছিল। সেতুর মাপ ঠিক রাখার জন্য বানরদের মধ্যে কেউ কেউ স্তম্ভনির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। আবার কেউ কেউ উপকরণ সংগ্রহ করছিলেন। উলুখাগড়া এবং গাছের গুঁড়ির সাহায্যে সেতু বাঁধার কাজ হয়েছিল। প্রথম দিনে ১৪ যোজন দূরত্ব পর্যন্ত সেতু তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে ২০ যোজন।

সেতু নির্মাণে গাছের গুঁড়ির কী ভূমিকা ছিল এই বর্ণনায় তা স্পষ্ট নয়। তবে একটা ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে, 'সেতুর কিছু কিছু অংশ বাঁধার জন্য গাছের গুঁড়ি এবং উলুখাগড়া ব্যবহৃত হয়।' যাই হোক, এগুলো সবই অনুমান। তুলসীদাসের রামচরিতমানসে রয়েছে কোনও এক ঋষি নল এবং নীলকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তারা জলে যাই নিক্ষেপ করুক তা ভেসে থাকবে, ডুববে না। কিন্তু এই ঘটনার কোনও উল্লেখ বাল্মীকির রামায়ণে নেই।

নীলের এই অভিশাপের বিষয়টি এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ অভিশাপের প্রসঙ্গে কিছু না লিখলেও, বাল্মীকি লিখেছেন, সেতুটি জলে ভাসমান এক ধরনের পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছিল। নল এবং নীলের স্পর্শের কারণেই পাথর তার ওজন হারিয়ে জলে ভাসছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সুনামির সময় রামেশ্বরমে এরকম পাথর দেখা গেছে। এই পাথর সত্যিই জলে ভেসে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় রামভক্তরা উল্লসিত। তাদের বক্তব্য, রামেশ্বরমের আশেপাশে ভাসমান পাথরের অস্তিত্বই প্রমাণ করে সেতু রামই তৈরি করেছিলেন। রামায়ণের বর্ণনা সঠিক। রাম ঐতিহাসিক চরিত্র।

তাঁরা সম্ভবত ভুল বলছেন না। কারণ রামায়ণে রামেশ্বরমের যে জায়গায় সেতু নির্মাণের কথা বলা হয়েছে বর্তমান সেতুটিও সেই একই জায়গায় অবস্থিত। বাল্মীকি কবি, ভূগোলবিদ নন। মহাকাব্যে বর্ণিত কোনও জায়গা যদি বর্তমান প্রেক্ষিতে একেবারে অক্ষাংশ- দ্রাঘিমাংশের চুলচেরা বিশ্লেষণে মিলে যায় তাহলে ধরে নিতেই হয় রামায়ণের ঘটনা ঐতিহাসিক। রামও কোনও কাল্পনিক চরিত্র নন। তাছাড়া, সাহিত্য যতই শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম হোক, কোনও মহাকাব্যিক চরিত্রের পক্ষে হাজার হাজার বছর ধরে জনমানসে রামের মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকা সম্ভব নয়। অন্যথায় বলতে হয় বাল্মীকির মতো মহাকবি সসাগরা পৃথিবীতে কেউ কখনও ছিলেন না। ভবিষ্যতেও কেউ থাকবেন না। যাই হোক, আবার আমরা সেতু প্রসঙ্গে ফিরে যাব। সিলিকা কোষের মধ্যে যদি বাতাস ভরে দেওয়া যায় তাহলে তাকে পাথরের মতো দেখতে লাগে ঠিকই কিন্তু ওজনে হয়ে দাঁড়ায় হালকা। এতটাই হালকা যে জলে ভেসে থাকতে পারে। অনেকটা বরফের মতো। এক গ্লাস জলে বরফের কয়েকটা টুকরো ছেড়ে দিলে দেখা যাবে সেগুলি ভেসে আছে। কিছুক্ষণ পর অবশ্য গলে জল হয়ে গ্লাসের জলের সঙ্গে মিশে যাবে। ছিদ্রযুক্ত পাথরও জলে ভেসে থাকতে পারে। ইংরেজিতে একে Pumice Stone বলে। এর সব থেকে ভালো উদাহরণ আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা শক্ত লাভা। আগ্নেয়গিরির ভেতর বাতাসের চাপ মারাত্মক। তাপমাত্রা ১৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাভা আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসে। কখনও কখনও সমুদ্রের জলে গিয়েও পড়ে। এতে দুটো ঘটনা এক সঙ্গে ঘটে। ঠাণ্ডা বাতাস বা জলের সংস্পর্শে এসে লাভার চাপ এক লহমায় অনেকখানি কমে যায়। তাপমাত্রার বিপুল তারতম্যের কারণে যে Cold Shock লাগে তাতেই জমে লাভা পাথর হতে শুরু করে। উল্লেখ্য, এই পাথরে ছিদ্র থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাথরের ৯০ শতাংশ জুড়েই থাকে ছিদ্র। এই ছিদ্রের কারণেই এই ধরনের পাথরের ঘনত্ব জলের থেকে কম। Pumice পাথরের জলে ভেসে থাকার কারণ মূলত এটাই। কিন্তু এই পাথর চিরকাল ভেসে থাকতে পারে না। ছিদ্রগুলি

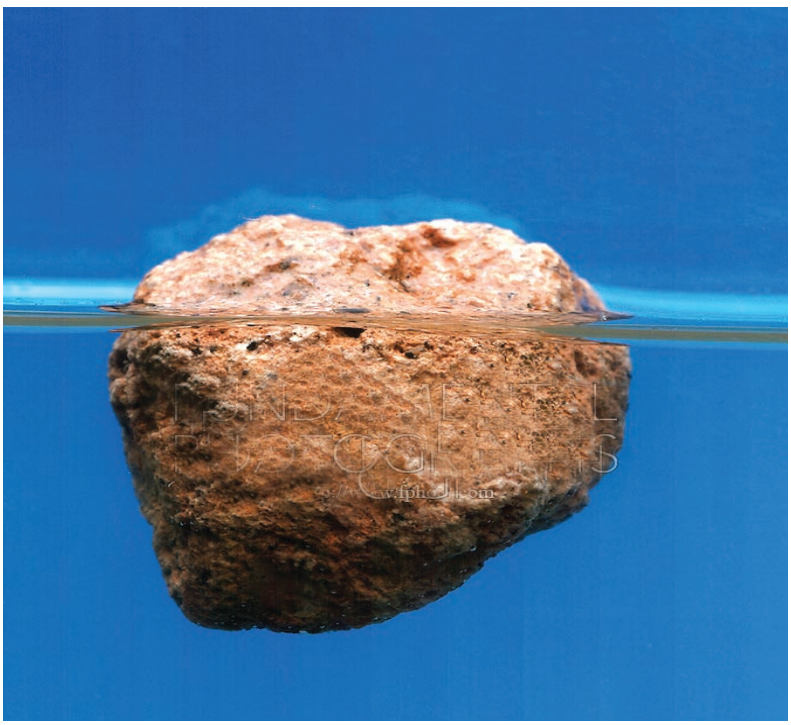

ভাসমান পাথর।

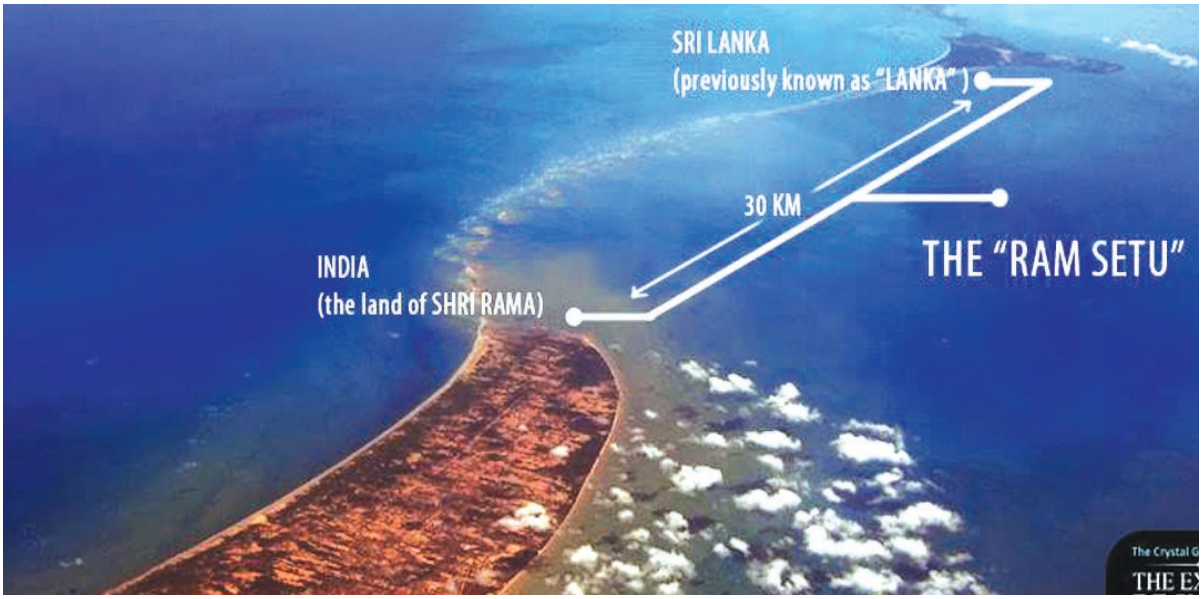

নাসার উপগ্রহচিত্রে রামসেতু।

জলে পূর্ণ হয়ে গেলেই ডুবে যায়। রামসেতুর অধিকাংশই যে এখন জলের তলায় তার কারণ Pumice পাথরের ডুবে যাওয়া হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো, রামসেতু কি আদৌ Pumice পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল? রামেশ্বরমে যেসব ভাসমান পাথর পাওয়া গেছে সেগুলি একটু বিচিত্র। এই পাথরের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের সঙ্গে যত্রতত্র পড়ে থাকা পাথরের বিরাট কোনও পার্থক্য নেই। দূর থেকে দেখলে মনে হতে পারে ওগুলো বুঝি প্রবাল! কিন্তু ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা দেখা গেছে প্রবাল নয়। আবার Pumice পাথরও নয়।

তা হলে কী? রামসেতু নির্মাণে ব্যবহৃত পাথর যে Pumice নয় তার একটা বড়ো প্রমাণ, রামেশ্বরমের আশেপাশে কস্মিনকালেও আগ্নেয়গিরি ছিল না। ভূতাত্ত্বিকদের গবেষণা তাই বলছে। তাছাড়া, রামেশ্বরমে যেসব ভাসমান পাথর পাওয়া গেছে সেগুলি Pumice পাথরের মতো হালকা নয়। রাসায়নিক চরিত্রেও আলাদা। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে সেতুনির্মাণে ব্যবহার করার জন্য অপেক্ষাকৃত ভারী ওজনের পাথর অন্য কোনও জায়গা থেকে আনা হয়েছিল। এবং এই পাথর অবশ্যই সচ্ছিদ্র পাথর। কিন্তু Pumice কি? প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, রামশ্বেরমে যে পাথর পাওয়া গেছে তার রং কালো। সাধারণত Pumice পাথরের রং হয় সাদা অথবা হলুদ।

এখানে একটা কথা অনস্বীকার্য Pumice হোক বা না হোক, রামসেতু কোন এক ধরনের ভাসমান পাথরেই তৈরি হয়েছিল। যার কিছু নমুনা এখনও রামেশ্বরমে পাওয়া যায়। বিশেষ করে সেই জায়গায় যেখানে রাম শিবের পুজো করে তার কাছ থেকে সেতু নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু এই কাহিনি প্রাচীন, ঘটনাটিও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমানিত নয়, তাই বিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা রামসেতু রামের তৈরি বলে এতদিন মানতে চাইতেন না। আবার রামেশ্বরমে পাওয়া পাথর পুরোপুরি Pumice চরিত্রের না হয়েও কীভাবে ভেসে থাকে তা বলতে পারেন না। এ এক আশ্চর্য গোলকধাঁধা! কেউ কেউ আবার একথাও বলেন যে রামসেতু প্রবালের তৈরি। নাসার কয়েকজন বিজ্ঞানী এই মতের সমর্থক। কিন্তু প্রবাল মূলত ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি হয়। এর ঘনত্ব জলের থেকে অনেক বেশি। প্রবাল দিয়ে তৈরি কোনও জিনিসের পক্ষে জলে ভেসে থাকা আদপেই সম্ভব নয়। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুজরাট— সর্বত্রই সমুদ্র রয়েছে। প্রবাল শুধু রামেশ্বরমেই পাওয়া যাবে, এটাও তো মেনে নেওয়া যায় না।

সুতরাং, বিজ্ঞানীরা যতদিন না ভাসমান পাথরের রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হন ততদিন আমরা বরং স্বীকার করে নিই, রামসেতু নল এবং নীলের স্থাপত্যকৌশলের একটি সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁরা পাথরকে জলে ভাসিয়ে রাখার প্রযুক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আমেরিকার গবেষকদের ইঙ্গিতও সেই দিকে। রামের ঐতিহাসিকতার স্বপক্ষে আরও কিছু যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে। ভারতজুড়ে রামের পরিক্রমার মানচিত্রটি খুঁজে বের করার প্রয়াস অনেকদিন ধরে চলেছে। মোট ১৯৫টি জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। বনবাসে থাকার সময় রাম যেসব ঋষির আশ্রমে গিয়েছিলেন তার প্রত্যেকটির সম্ভাব্য ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করা গেছে। এত কিছুর পরেও রামের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক হয়। মুশকিল হলো, ভারতবর্ষ রামকে ভগবান হিসেবে দেখে। আমরা ভুলে যাই ভগবত্তা একটা বিশেষ গুণ। মানুষই সেই গুণ অর্জন করে। ভগবত্তার অধিকারী সেই মানুষটিকে পূজার্চনার আড়ালে আমরা তাঁর মূল্যায়নের পথ রুদ্ধ করে দিই। রামের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আমরা হৃদয়ের দেবতাকে পেয়েছি ঠিকই কিন্তু হারিয়ে ফেলেছি ধনুর্ধারী মর্যাদা পুরুষোত্তমকে। এই কারণেই রামের ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বারবার। ❙

নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'মিশন সাহসী'

গার্গী মণ্ডল

প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েই নরেন্দ্র মোদী মেয়েদের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেন। আর্থিক ও সামাজিক ভাবে মহিলাদের সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানাবিধ প্রকল্পও চালু করেছেন। তার ফলে মহিলারা আজ জাতীয় উন্নয়নের শরিক হয়েছেন। তা সত্ত্বেও ঘরে-বাইরে মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সরকারি যোজনার সঙ্গে সঙ্গে বহু সামাজিক সংস্থা নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রসংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য 'মিশন সাহসী' নামে একটি মঞ্চের মাধ্যমে মহিলাদের আত্মবিশ্বাস নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই এই মিশন সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহণ করেছে।

ছাত্রীদের আত্মরক্ষার কৌশল প্রদর্শনে অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন।

গত দেড়-দু মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায়, বিশেষত ফেসবুক- টুইটারে মিশন সাহসীর বহুল প্রচার চলছে। মিশন সাহসী হলো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি প্লাটফর্ম। এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের কৌশল শেখানো হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে যেভাবে মহিলাদের উপরে অত্যাচারের ঘটনা বেড়ে চলেছে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার একটা সংগঠিত মাধ্যম হলো মিশন সাহসী। এটি ছাত্রীদের বা সমাজের মহিলাদের সংগঠিত শক্তির প্রতিধ্বনি। এর মাধ্যমে সমাজের মহিলারা ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আরেক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবে। সমাজের বুকে যদি কোনো মহিলার শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে তাহলে সেই মেয়েটি তা প্রতিহত করার সঙ্গে সঙ্গে যেন মোক্ষম প্রহার করতে পারে সেই সাহস তৈরির মাধ্যম হলো মিশন সাহসী। এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে শহরে থাকা মহিলা বা ছাত্রীদেরই শুধু নয়, বিভিন্ন কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে পড়তে আসা ছাত্রীদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখানোর মাধ্যম মিশন সাহসী।

শুধুমাত্র বাইরের নয়, পরিবারের মধ্যেও আজকে মেয়েদের বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঘরের মেয়ে বউকে মেরে ফেলা হচ্ছে। তাই এই হিংসার প্রতিকার তারা যাতে করতে শেখে সেই চেষ্টাই মিশন সাহসীর মাধ্যমে বিদ্যার্থী পরিষদ করে চলেছে। গত একমাস ধরে লাগাতার বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রীদের নিয়ে মাস্টার সাইফুজি আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মাস্টার সাইফুজি মার্শাল আর্ট এবং কারাটে ট্রেনার হিসেবে সুপরিচিত। তিনি বিদ্যার্থী পরিষদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে নিজে এগিয়ে এসেছেন ছাত্রীদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখানোর জন্য, যাতে ছাত্রীরা নিজেদের আত্মসম্মান নিজেরাই বাঁচাতে পারে। গত ৬ মার্চ মুম্বাইয়ে বিদ্যার্থী পরিষদের ব্যানারে মিশন সাহসীর গ্র্যান্ড সেলিব্রেশানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। এছাড়াও বলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন এবং বিদ্যার্থী পরিষদের বিশিষ্ট পদাধিকারীদের সামনে এই দিন একসঙ্গে ১০ হাজার ছাত্রী আত্মরক্ষার কৌশল প্রদর্শন করে। পরিষদের উদ্দেশ্য মহিলারা শুধুমাত্র আঘাত করতে শিখবে তাই নয়, যাতে তারা মানসিক দিক থেকে মজবুত হয়, তাদের সামনে কোনও অন্যায় ঘটলে যাতে তারা প্রতিকার করতে পারে সেই প্রয়াসও মিশন সাহসীর মাধ্যমে করা হচ্ছে। বিদ্যার্থী পরিষদও মনে করে নারী সুরক্ষিত না হলে রাষ্ট্র কখনোই সুরক্ষিত হতে পারে না। তাই শুধুমাত্র মুখেই নারীর ক্ষমতায়নের কথা নয় কাজের মাধ্যমেও প্রমাণ করে দেওয়ার প্রয়াস মিশন সাহসী। পুরাণে মা দুর্গা অসুর নিধন করছেন। কৈকেয়ী রাজা দশরথের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে শত্রু নিধন করছেন। তাঁদের উত্তরাধিকারী হয়েও নারী সমাজ আজ অবহেলিত। তাই ঝাঁসির রানীর শক্তিকে স্মরণ করে এবং তাঁর সাহসকে প্রতীক করে মিশন সাহসীর মতো প্ল্যাটফর্ম বিদ্যার্থী পরিষদ তৈরি করেছে। একটাই লক্ষ্য— মিশন সাহসীর মতো প্ল্যাটফর্মে সমাজের সর্বস্তরের নারীরা অংশগ্রহণ করুক এবং এটি নারীর ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হোক।

(লেখিকা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রদেশ ছাত্রী প্রমুখ ও কেন্দ্রীয় কার্য সমিতি সদস্য)

ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার ট্র্যাডিশন এখনও চলছে

বরুণ দাস

রামসেতু কার? প্রকৃতির, না বানরসেনার? কিছুদিন আগে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল ভারত জুড়ে। দক্ষিণে সেতুসমুদ্রম্ প্রকল্প নির্মাণের সময়ই বিষয়টি নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায়। ফলে প্রকল্পটি তখন শুরুই করা যায়নি। সম্প্রতি আবার স্থগিত থাকা কেন্দ্রীয় প্রকল্পটি নিয়ে কথাবার্তা চলছে। কারণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উপকৃত হবেন অনেকেই। সাগর থেকে পলি তুলে জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত করে তোলার কাজটি আটকে রয়েছে। কারণ পলি তুলতে গেলেই হাত পড়বে 'পৌরাণিক রামসেতু'তে।

রামসেতুর পৌরাণিক গুরুত্ব থাকলেও এর কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই বলে অনেকেই মনে করেন। তাই রামসেতুর 'অস্তিত্ব' নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন এদেশের স্বঘোষিত অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকরা। তাঁদের সঙ্গে গলা মেলাতে এগিয়ে আসেন এদেশের অতি-সচেতন বিশিষ্টজন সহ প্রাজ্ঞ ও প্রগতিশীল ইতিহাসবিদরাও। ফলে এতদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসীর বিশ্বাস ও ভাবাবেগকে কোনও রকম গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। বিষয়টি নাকি নিতান্তই 'পৌরাণিক।' তাছাড়া হিন্দুদের মহাকাব্য রামায়ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

অতএব এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজনই বোধ করেননি সরকার বাহাদুর। বিষয়টি সামান্য খতিয়ে দেখারও প্রয়োজন বোধ হয়নি। যে-কোনও প্রাচীন জনশ্রুতি বা পৌরাণিক ঘটনারও যে গুরুত্ব আছে, তা কেউ স্বীকার করতেও চাননি। যেহেতু এর সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ 'হিন্দুত্বের কটুগন্ধ' আছে, হিন্দু ও হিন্দুত্ব যেখানে, তাকে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নেই সেখানে— এমন একটা গড়পড়তা হীন মানসিকতা কাজ করে এদেশে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার বটে। এদেশে হিন্দু হয়ে জন্মানোটাই যেন সীমাহীন অপরাধ।

'পুরাণ শব্দটির অর্থ প্রাচীন অথবা প্রাচীন বর্ণনা। তবে যিশু খ্রিস্টের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে যে বিশেষ অর্থে তা হলো, বিশেষ ধরনের গ্রন্থাদি যাতে প্রাচীন পৃথিবী সংক্রান্ত কাহিনি ও ইতিহাস স্থান পেয়েছে। খ্রিস্ট্রীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত অমরকোষে পুরাণের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, পুরাণ হলো দেবতা, অসুর, ঋষি, রাজা ইত্যাদিদের বংশ তালিকা, মন্বন্তরের বিবরণ, বংশানুচরিত, রাজবংশসমূহের বিবরণ, স্বাভাবিক নিয়মে সৃষ্ট যে বিশ্বজগৎ সে সবেরই কাহিনি।'

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। 'অবশ্যই পুরাণকে আদিম মানুষের বিশেষ এক প্রকাশমাধ্যম বলে আমরা অভিহিত করতে পারি। দর্শনের উদ্দেশ্য যদি হয় চরম সত্যের আবিষ্কার, তবে বলা যায় পুরাণের মাধ্যমে প্রাচীন মানুষ উপান্ত সত্যে উপনীত হতে প্রয়াস করেছিল।' সুতরাং পুরাণকে আমরা কোনওভাবেই উপেক্ষা করতে পারি না। লোকসমাজ মনে করেন, পুরাণে যা বিবৃত হয়, একদিন তা অবশ্যই ঘটেছিল। জনশ্রুতির মধ্যে ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্রের সন্ধান মিলতে পারে। সুতরাং বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আপত্তি কোথায়?

উল্লেখ্য, পুরাণকে আমরা ইতিহাস বলতে পারি না একথা ঠিক। কারণ পুরাণের কোনও ধারাবাহিকতা বা পর্যায়ক্রম আমরা দেখতে পাই না যা ইতিহাসের অন্যতম শর্ত। কিন্তু পুরাণের মধ্যে প্রাচীন, অগোছালো, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু সত্যকে ধরার চেষ্টা রয়েছে। যার সত্যতা বিচার করা আজ সত্যিই দুঃসাধ্য। তবু ইতিহাসের পূর্বসূরি হিসেবে একটা দেশ, জাতির শিকড় অনুসন্ধানে আমাদের পুরাণের দ্বারস্থ হতেই হবে। সেজন্য পুরাণাশ্রিত ইতিহাস কথাটির ওপর জোর দিয়ে থাকেন কোনও কোনও ইতিহাসবিদ।

সম্প্রতি রামসেতু নিয়ে ময়দানে নেমেছেন কেন্দ্রের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। পৌরাণিক রামসেতুর সত্যতা যাচাইয়ে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চকে দায়িত্ব সঁপেছেন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের মন্ত্রক। তাঁরা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন রামসেতুর সত্যতা। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনির সত্যাসত্য যাচাইয়ের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন এদেশের স্বঘোষিত 'অসাম্প্রদায়িক' রাজনীতিকরা। তাঁদের সঙ্গে গলা মেলাতে এগিয়ে এসেছেন অতি-সচেতন বিশিষ্টজন -সহ অতি-প্রগতিশীল ইতিহাসবিদরাও।

তাঁরা ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন। কূটপ্রশ্ন তুলেছেন, 'পৌরাণিক কাহিনি'র সত্যাসত্য যাচাইয়ে কেন্দ্রের এতো মাথাব্যথা কিসের? পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় খরচ নেহাত কম নয়। তাই তাঁদের কটাক্ষ, 'প্রকৃত অর্থে জলেই যাবে কেন্দ্রের বরাদ্দকৃত এই টাকা।' হিন্দুদের মহাকাব্য রামায়ণের 'গালগল্প'কে গুরুত্ব দেওয়ার কোনও মানেই হয় না। এভাবে সাধারণ মানুষের প্রদত্ত করের টাকা নষ্ট করার কোনও অধিকারই নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। এ আসলে হিন্দু ও হিন্দুত্ববাদিদের অহেতুক প্রশ্রয় দেওয়া।

এই প্রাসঙ্গিক পদক্ষেপে এদেশের স্বঘোষিত অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিক, অতি-সচেতন বিশিষ্টজন সহ প্রাজ্ঞ ও প্রগতিশীল ইতিহাসবিদের শঙ্কিত হবার কোনও কারণ নেই। কারণ সত্য-মিথ্যা প্রমাণের দায় সরকারেরই। বিষয়টি অহেতুক ঝুলিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। তাঁরা এতদিন বাদে সেই করণীয় কাজটিই করতে চলেছেন। এতে অন্যায় ও দোষেরও কিছু নেই। সরকারের অনেক কাজে অনেক টাকাই ব্যয় হয়। একে 'নষ্ট' মনে করার কোনও কারণ নেই। প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন তো সরকারেরই কাজ।

রামায়ণে বর্ণিত রামসেতুর ইতিহাস

খতিয়ে দেখবে কেন্দ্রের গড়ে দেওয়া হাই প্রোফাইল একটি টিম। সেতু প্রকৃতির খেয়ালে গড়ে উঠেছে, নাকি ম্যান মেড— তাই হবে এই হাই প্রোফাইল কমিটির প্রধান বিচার্য বিষয়। যদি প্রথমটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির খেয়ালেই গড়ে উঠেছে এই সেতু, তাহলে পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের 'সেতুসমুদ্রম্ প্রকল্প' গড়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকবে না। আর যদি দ্বিতীয়টিই সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সেতুসমুদ্রম্ প্রকল্পটি সরিয়ে অন্যত্র করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, জলের নীচে ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কাকে জুড়েছে চুনাপাথরের সারি। নাসা'র উপগ্রহ চিত্রেও সেই ছবি স্পষ্ট ধরা পড়েছে। তামিলনাড়ুর পম্বন দ্বীপ থেকে শ্রীলঙ্কার মান্নার দ্বীপ পর্যন্ত সারিবদ্ধ চুনাপাথরকে অ্যাডম ব্রিজ বলা হয়। কিন্তু মহাকাব্য রামায়ণে বিশ্বাসী এদেশের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, এটা আসলে বানরসেনার তৈরি রামসেতু। রামায়ণের কাহিনি অনুসারে তাঁদের দাবি, লঙ্কাধিপতি রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারের জন্য সাগরে পাথর ফেলে ওই সেতু বানিয়েছিলেন বানর সেনারা।

প্রকৃত তথ্যের খাতিরে একটু পিছন ফেরা যাক। ২০০১ সালে এদেশের মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র নাসা জানিয়েছিল যে, তামিলনাড়ুর পম্বন দ্বীপ থেকে শ্রীলঙ্কার মান্নার দ্বীপ পর্যন্ত সারিবদ্ধ চুনাপাথরের ওই 'অ্যাডম ব্রিজ' বা রামায়ণে উল্লেখিত রামসেতু ম্যান মেড। যদিও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে পরে নাসা তাঁদের আগের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়। আগের বক্তব্য থেকে সরে আসার কোনও নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ না করে তাঁরা পুনরায় বলে, মানুষ ওই সারিবদ্ধ চুনাপাথর ফেলেছে 'এমন প্রমাণ' নেই।

আগের বক্তব্য থেকে নাসা'র একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ডিগবাজি খাবার কোনও কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। কার বা কাদের গোপন নির্দেশে তারা এমন বিপরীত অবস্থান নিলেন, তা আজও কিন্তু রহস্যাবৃত। তবে পরের বছর অর্থাৎ ২০০৩ সালে ত্রিচুরির রিমোট সেনসিং সেন্টার এক রিপোর্টে জানায়, চুনাপাথরগুলি 'রামায়ণের কাছাকাছি' সময়েরই। তবে তা ম্যান মেড কিনা সে বিষয়ে কোনও আলোকপাত করেনি ওই রিপোর্ট। এখানেও কিন্তু অতি সচেতনভাবে ওই একই গোপনীয়তা।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে ইউপিএ সরকার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানায়, ওই সেতু যে বানরসেনার তৈরি এমন কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ এখানেও সেই 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র অবস্থান কেন্দ্রীয় সরকারের।

'পৌরাণিক কাহিনি'র সত্যাসত্যকে উদ্‌ঘাটন না করে সাবেকি রামসেতু বিতর্ককে সচেতনভাবে বিশ বাঁও জলে ফেলে দেবার সরকারি চক্রান্ত। ভোটের হিসেব মাথায় রেখে পা ফেলতে অভ্যস্থ এ দেশের কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ-র স্বঘোষিত প্রগতিশীল সরকারও। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সেতুসমুদ্রম্ প্রকল্পটি ঝুলে থাকে। সাগর থেকে পলি তুলে তা জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত করে তোলার প্রয়োজনীয় কাজটি আটকে রয়েছে আজও। কারণ সাগর থেকে পলি তুলতে গেলেই হাত পড়বে বা রামায়ণে বর্ণিত রামসেতুতে। তবে সে বছরই মহামান্য মাদ্রাজ হাইকোর্ট স্পষ্টতই বলেছিল, সেতুটি মানুষের (এক্ষেত্রে বানরসেনার) তৈরি হতেই পারে। এরপর আদালত জানতে চায়, কেন ওখান থেকে প্রকল্প অন্যত্র সরানো যাবে না, তা হলফনামা দিয়ে জানাক কেন্দ্র।

বলাবাহুল্য, রামসেতু নিয়ে পরস্পরবিরোধী মতামত শুরু থেকেই রয়েছে। কিন্তু ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখে কেউই সাহস নিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করেননি এ পর্যন্ত। কেন্দ্রের বর্তমান সরকার অন্তত এ বিষয়ে সাহসী উদ্যোগ দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ (আইসিএইচআর)-এর চেয়ারপার্সন ওয়াই সুদর্শন রাওয়ের কথায়, 'আমরা এই বিতর্কের ইতি টানতে চাইছি। আমাদের মহাকাব্যে ও সাহিত্যে যা লেখা রয়েছে, তার বাস্তব ভিত্তি কতটা, সেই প্রমাণ এবার পাওয়া যাবে।'

ওয়াই সুদর্শন রাও আরও বলেন, 'ভারতের পশ্চিম উপকূলে যে প্রাচীন দ্বারকা নগর ছিল, তা বার বার পৌরাণিক কাহিনি ও সাহিত্যে উঠে এসেছে। সেই শহর যে পরে সমুদ্রের জলে তলিয়ে যায়, তারও উল্লেখ রয়েছে। পূর্ব উপকূলেও যে অনেক কিছু জলে তলিয়ে গিয়েছে, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। রাওয়ের দাবি, পুরাণের খোঁজে নয়, পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে রামসেতুর সত্যতা যাচাই করবে আইসিএইচআর।' এই দাবিকে সমর্থন জানাতে আপত্তি কোথায়?

শ্রী রাওয়ের 'দাবি'র মধ্যে ইতিমধ্যেই উগ্র হিন্দুত্বের কটুগন্ধ পেয়েছেন এদেশের স্বঘোষিত অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিক, অতি-সচেতন বিশিষ্টজন সহ অতি-প্রগতিশীল ইতিহাসবিদরা। তাঁরা দলবেঁধে পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার বিরুদ্ধে ক্রমশ সমালোচনার সুর চড়াচ্ছেন। এমনকী, কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে উগ্র হিন্দুত্ব জাগরণের 'নয়া কৌশল' বলে প্রচারেও নেমে পড়েছেন। তাঁরা চান না প্রকৃত সত্যি সামনে আসুক। সত্যকে বরাবর ঢেকে রাখতেই আগ্রহী তাঁরা।

যে-কোনও বিষয়ে অযথা জট-জটিলতা পাকিয়ে রাখার দিকেই নজর এঁদের। জট খোলার দিকে ন্যূনতম নজর নেই কারও। নিজেরা বিতর্কের বাইরে থাকতে অনেক সময়ই রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার বল ঠেলে দেন মহামান্য আদালতের দিকে। যে বিষয় পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে মিটিয়ে নেওয়া যায়, ভোটের দিকে তাকিয়ে তাকেও জটিল করে তোলেন এবং নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে থেকে সমস্যা ঠেলে দেন মহামান্য আদালতের দিকে। যে সমস্যার সমাধান আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে।

আইসিএইচআর-এর রিপোর্ট যাই হোক না কেন, তাকে মেনে নিতে হবে দেশবাসীকে। বিষয়টি অহেতুক ঝুলিয়ে না রেখে কেন্দ্রীয় সরকার যে 'সাহসী পদক্ষেপ' নিয়েছেন, তাকে সমর্থন না জানালেও বিরোধিতা করা বোধহয় ঠিক নয়। কারণ প্রকৃত সত্য উন্মোচন হোক--- ধুরন্ধর রাজনীতিকেরা তা না চাইলেও প্রদেশের সাধারণ মানুষ চান। শুধু ভোট-ভিখারিদের হাতে তামাক খাওয়া একদল পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসবিদ চান না প্রকৃত সত্যের উন্মোচন।

অটিজম ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

অটিজম স্পেকটাম ডিসঅর্ডার (এ এস ডি) হলো এমন এক ব্যাধি, যাতে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই সমস্যা শিশুকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তার পক্ষে আশপাশের মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করা সম্ভব হয় না। স্কুল বা কোনও অনুষ্ঠানে, সর্বত্রই একঘরে হয়ে থাকতে হয় তাকে। ফলে খেলাধুলা, পড়াশুনার মতো সাধারণ ও স্বাভাবিক কাজগুলো করতেও সমস্যা হয় তার। চিকিৎসা বিজ্ঞান মোতাবেক এ এস ডি-র পরিসর বেশ বড়ো। অ্যাসপারগার'স ডিসঅর্ডার, চাইল্ড ডিসইন্টেগ্রিটিভ ডিসঅর্ডার ও পারভেসিভ ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডারের মতো সমস্যাগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত। অনেক সময় এগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা হতো। সাধারণত ২-৩ বছর বয়সি বাচ্চাদের মধ্যেই প্রথম এ এস ডি-র লক্ষণ দেখা যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাত্র ১৮ মাস বয়সেও শিশুর এই রোগ ধরা পড়ে।

● সব শিশুর ক্ষেত্রেই কি রোগের উপসর্গ এক হয়?

এ এস ডি-র প্রভাবের মতোই তার লক্ষণে ও উপসর্গও বিভিন্ন এবং এর পরিসরও বিরাট। কিছু কিছু বাচ্চার সমস্যা তুলনামূলক কম। অনেককে আবার বেঁচে থাকার জন্য অনেক বেশি লড়াই করতে হয়, তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এদের সকলেরই কমবেশি সমস্যা থাকে। যেমন— অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে কষ্ট হয়। কথা বলে বা ইশারায় মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে সমস্যা হওয়াতেই এই বিপত্তির সূত্রপাত।

● অটিজমের কারণ কী?

এর পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে জিনগত ত্রুটি, গর্ভাবস্থায় মায়ের সমস্যা, সংক্রমণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

● কী ধরনের লক্ষণ অটিজমকে নির্দিষ্ট করে?

যদি আপনার শিশুর আচরণে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখেন, তবে অবশ্যই সতর্ক হোন। তাকে নাম ধরে ডাকলে সে যদি সাড়া না দেয় কিংবা শিশুদের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত রাগ বা জেদ অটিজমের উপসর্গ হতেই পারে। এছাড়াও এই রোগের লক্ষণগুলি হলো জন্মের পর থেকে প্রথম ছয়মাসের মধ্যে শিশু যদি হেসে প্রত্যুত্তর না দেয়।

এক বছর বয়সের মধ্যে যে যদি আধো আধো কথা বলতে না শেখে কিংবা কোনও নির্দিষ্ট দিক বা বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলে সে তাতে সাড়া না দেয়। কথা বলার সময় সে যদি অন্যজনের চোখের দিকে না চায়। বাঁধাধরা গতে রোজকার জীবন চালানোও এই সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। এক্ষেত্রে ডেইলি রুটিনে হঠাৎ কোনও পরিবর্তন সে মেনে নিতে পারে না। কথা বলার সময় একই শব্দ বারবার উচ্চারণ করা কিংবা বারবার একই ধরনের অঙ্গভঙ্গি করাও অটিজমের উপসর্গ। যেমন শিশুর বারবার ঘাড় নাড়ানো, সামনে এবং পিছনের দিকে ঝোঁকা ইত্যাদি। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। আটিজমে আক্রান্ত শিশুর মধ্যে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। যেমন— একটা কাজ করতে করতে অন্য কাজ শুরু করতে সমস্যা। হাত ঘোরাতে, মুঠো করতে সমস্যা, কিছু নির্দিষ্ট আওয়াজ, মন খারাপ হওয়া প্রভৃতি।

খুব অল্প সংখ্যক খাবারই তার ভালো লাগবে। তার আগ্রহের বিষয়বস্তু সীমিত, যেমন একই বিষয় নিয়ে বারবার কথা বলা। একটি নির্দিষ্ট খেলনার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি।

● অটিজম আক্রান্তের শক্তি এবং দুর্বলতা কী কী?

অটিজম স্পেকটাম ডিসঅর্ডার মানেই সব সময় মানসিক দুর্বলতা বোঝায় না। তাছাড়া প্রত্যেক শিশুর উপর রোগের প্রকোপের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। এদের প্রত্যেকের পছন্দ-অপছন্দ আলাদা হয়। কারোর হয়তো ছবি আঁকতে ভালো লাগে। কেউ ভালোবাসে বাজনা শুনতে। চিকিৎসার সময় এই বিষয়গুলির খেয়াল রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

● অটিজমের সঙ্গে জড়িত মিথগুলি কী কী?

মিথ : টিকাকরণের জন্য অটিজম হয়।

সত্য : টিকাকরণ আপনার শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটায়। তা কখনোই অটিজমের কারণ নয়। তাই নিশ্চিন্তে সন্তানকে প্রয়োজনীয় টিকাগুলি দিন।

মিথ : অটিজমে আক্রান্তরা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়।

সত্য : এটাও কোনও চিরন্তন সত্য নয়। এমন অনেক মানুষ আছে যারা অটিজমে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের উঁচুদরের শিল্পী হিসেবে প্রমাণ করেছে। এদের আই কিউ লেভেল বা বুদ্ধিমত্তাও যথেষ্ট বেশি হতে পারে।

মিথ : অটিজমে আক্রান্তরা কখনো কোনও সম্পর্ক তৈরি করতে বা তাতে আবদ্ধ থাকতে পারে না।

সত্য : অটিজমে আক্রান্তদের অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কিছু সমস্যা হয় ঠিকই। কিন্তু তার মনে এই নয় যে তারা সম্পর্ক স্থাপনেই সম্পূর্ণ অক্ষম। তাদের সন্তান হতে পারে।

অটিজমের চিকিৎসা : অটিজম জিনগত সমস্যা তাই পুরোপুরি সেরে ওঠা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে যে সমস্ত ওষুধগুলি ব্যবহার করা যায় তা হলো, সিফিলিয়াম, আর এন-এ, ডি এন এ, ব্রেন জিঙ্ক সালফ, জিঙ্কভ্যাল, সালফোনল প্রভৃতি। তবে কখনোই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।■

বাবার নামে পাহাড়, গর্বিত কন্যা

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সাধারণত মেয়েরা বাবাকে একটু বেশি ভালোবাসেন। ভারতের পরিবারকেন্দ্রিক সামাজিক কাঠামোয় বাবা এবং মেয়ের সম্পর্ক সব থেকে পবিত্র সম্পর্ক। এর মধ্যে চাওয়া- পাওয়ার কোনও দ্বন্দ্ব নেই। তাই যখন কোনও মেয়ে বাবার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পান, তখন তা হয়ে ওঠে তার সারা জীবনের সম্পদ। সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের তেঙ্গায় কর্মরত ভারতীয় সেনার এক মহিলা লেফটেন্যান্টের এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

এখানে বলে রাখা ভালো, ওই মহিলা লেফটেন্যান্ট সাংবাদিকদের তাঁর নাম প্রকাশ করতে বারণ করেছেন। আমরা ধরে নিলাম তাঁর নাম পূজা দাস। অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং সেক্টরে কিয়া ফো আউটপোস্টে কাজে যোগ দেওয়ার পর এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা হয়েছে পূজার। কিয়ো ফো পার্বত্য অঞ্চল। সেখানে একটি পাহাড়চূড়ার নাম আশিস। নাম শুনে তো পূজা অবাক। এরকম অদ্ভুত নাম পাহাড়ের হয় না। তাও আবার অরুণাচলে। খোঁজখবর নিয়ে পূজা জানতে পারেন পাহাড়ের নামকরণ করা হয়েছে তাঁর বাবা আশিস দাসের নামে। আশিস দাস অসম রেজিমেন্টের কর্নেল হিসেবে অবসর নিয়েছেন কিছুদিন আগে। পাহাড়ের নামের রহস্যভেদ করার কিছুক্ষণ পরেই পূজা ফোন করেন বাবাকে।

অরুণাচলে সেই আশিস টপ। (ইনসেটে কর্নেল আশিস দাস)

আশিস দাস বলেন, 'মেয়ে যখন ফোন করল আমি তখন বাড়িতে। ১৯৮৬ সালে আমরা কী করেছিলাম সে ব্যাপারে বাড়িতে আমি অনেকবার গল্প করেছি। কিন্তু মেয়ে তখন জন্মায়নি। তাছাড়া পাহাড়ের নাম যে আমার নামে রাখা হয়েছে সে খবর আমিই পেয়েছি ২০০৩ সালে। চীনা বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে ১৪ হাজার ফুট উচ্চতায় ওই আউটপোস্টের দখল নেবার ১৭ বছর পর।'

১৯৮৬ সালের সেই রোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ শুনিয়েছেন আশিস দাস নিজেই। এখনকার মতো তখনও চীন প্রায়শই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতে ঢুকে পড়ত। উদ্দেশ্য যে দখলদারি সে কথা বলাই বাহুল্য। ১৯৮৬-তে চীন অরুণাচল প্রদেশের সামদোরং চু উপত্যকায় শুধু ঢুকেই পড়েনি, রাস্তাঘাট এবং সামরিক অভিযানের উপযোগী কিছু নির্মাণও শুরু করে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর তখনকার জেনারেল কে. সুন্দরজীর নির্দেশে অপারেশন ফ্যালকন শুরু হয়। অপারেশনের সময় একটা পুরো ইনফ্যানট্রি ব্রিগেডকে রাশিয়ার তৈরি মিগ-২৬ হেলিকপ্টারে করে সামদোরং চুর কাছে (তাওয়াং থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে) জেমিনথাঙে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

আশিস দাস বলেন, 'ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় কেটে রাস্তা বানিয়ে স্যাঙ্গেটসার লেকে পৌঁছই। চীনারা লেকের ওপারে অপেক্ষা করছিল। আমাকে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ তৈরি করে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আমি সুড়ঙ্গ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। এর মধ্যে একদিন বরফে ঢাকা কিয়া পোতে বিস্ফোরণ ঘটাল চীন। তখনও জানি না সুড়ঙ্গর মধ্য দিয়ে আমি চীনাশিবির পেরিয়ে কিছুটা চলে এসেছি। বিমান থেকে খাবারের প্যাকেট ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু তা চীনের অধিকৃত অঞ্চলে পড়ে। মনে আছে মেঠো ইঁদুরের সঙ্গে আমার দিন কাটত। দিনের পর দিন না খেয়ে কেটেছে। কতদিন স্নান করিনি। অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছি, কিন্তু মাটি ছাড়িনি।'

ওনামের দিন আশিস দাসকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজনের একটি বাহিনী পাঠানো হয়। কিন্তু চীনাবাহিনী এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময় সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসেন আশিস দাস। একাই মুখোমুখি হন চীনবাহিনীর। তিন দিন ধরে লড়াই করে চীনাবাহিনীকে পিছু হঠতে তিনি একরকম বাধ্য করেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর চীন এবং ভারতের বাহিনীর মধ্যে একটি ফ্ল্যাগমিটিং হয়। দু'পক্ষই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। মুখ্যত আশিস দাসের নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনীর এই সাফল্যে ভারত সরকার অরুণাচল প্রদেশকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা দিতে তৎপর হয়। তখন থেকেই ওই আউটপোস্টের নাম আশিস টপ। ওখানে গেলেই চোখে পড়বে পাহাড়। যার নীচে রয়েছে একটি সাইনবোর্ড। বোর্ডে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে পাহাড়ের নাম— আশিস টপ।

সাইনবোর্ডে বাবার নামে পাহাড়ের নাম দেখেই পূজা অবাক হয়েছিলেন। সব জানার পর বাবার সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা অনেকটাই বেড়ে গেছে। বিশেষ করে একজন সৈনিক যখন জানতে পারেন তার সৈনিক বাবা একাই বিদেশি শত্রুকে রুখে দিয়েছিলেন তখন তাঁর থেকে গর্বের আর কীই বা হতে পারে! যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ এই স্বপ্নই দেখেছে। প্রবীণ পথ দেখাবেন। নবীন তার নতুন যুগের আত্মবিশ্বাস সম্বল করে এগিয়ে যাবেন সেই পথ ধরে। ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে এগোবে সমাজ। এগিয়ে যাবে দেশ। ■

দুঃসাহসিক অভিযানে ইন্ডিয়ান নেভি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রের অতল, সর্বত্রই ত্রিবর্ণ জয়পতাকা উড়িয়ে দিয়ে এসেছে ইন্ডিয়ান নেভি। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, এক দশক আগেই ভারতীয় নৌবাহিনীর কম্যান্ডার সত্যব্রত দাম

এমন অতি-মানবিক কীর্তি রচনা করেছেন যা গোটা দেশকে শিহরিত ও রোমাঞ্চকর অনুভূতির পরশে জারিত করে দিয়েছিল। প্রথমে মাউন্ট এভারেস্ট তারপর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু জয় করে প্রথম ভারতীয় হিসেবে সত্যব্রত তিনভুবনের তিন মেরু জয় করার দুর্লভ কৃতিত্বের ভাগীদার হন। বিশ্বে সর্বপ্রথম এই কীর্তি স্থাপন করেন চিরপ্রণম্য ব্রিটিশ অভিযাত্রী স্যার ক্রিস বলিংটন। মঙ্গলগ্রহ কিংবা চন্দ্রাভিযানের থেকে অনেক বেশি কঠিন ও গৌরবের এই তিন মেরু অভিযান। জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে এইসব অভিযানের কোনও বিকল্প নেই। অভিযাত্রীদের এইসব অভিযানের মাধ্যমে মেরু ও পার্বত্য অঞ্চলে বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন রকম গবেষণার পথ খুলে যায় যা সভ্যতাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

অ্যাডভেঞ্চারধর্মী বিবিধ খেলায় তাই ইন্ডিয়ান নেভি সর্বপ্রকার উৎসাহ দেওয়াই শুধু নয়, সমস্তরকম সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে বছরের পর বছর। নৌবাহিনীর দুজন অফিসার মাউন্ট এভারেস্ট সামিট করেছেন আর ইয়েটিংটিম একবার দুনিয়ার বহু দেশ ক্রসকান্ট্রি সেইলিং করে এসেছে। ২০০৪ সালে সর্বপ্রথম কম্যান্ডার সত্যব্রত দামের নেতৃত্বে দুর্গম নর্থকল বা তিব্বতের দিক থেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ অভিযান করে নৌবাহিনীর বিশেষ টিম। প্রতিটি সদস্য অসীম মনোবল, ধৈর্য, অধ্যবসায় পরিশ্রমকে পাথেয় করে প্রথম প্রয়াসেই মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন। তারপর ২০০৬ সালে একই টিম তার নেতৃত্বে বরফ সমুদ্রে ২৫০ কিলোমিটার স্ট্রেচ করে সমস্ত বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে আন্টার্কটিকা বা দক্ষিণ মেরু পরিক্রমা করেন। দু' বছর পর টিমে সামান্য অদলবদল করে কতিপয় নতুন অভিযাত্রী নিয়ে সত্যব্রত পাড়ি জমান গ্রিনল্যান্ড থেকে আলাস্কা পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তরমেরু অভিযানে। কী আশ্চর্য, এস্কিমোদের থেকে বেশি দক্ষতা ও শক্তি প্রদর্শন করে সত্যব্রত ও তাঁর সঙ্গীরা উত্তর মেরুর ভরকেন্দ্র আন্টার্কটিকায় ভারতমাতার জয়ডঙ্কা বাজিয়ে এলেন যা দেখে অ্যাডভেঞ্চার ইভেন্টে একমেবাদ্বিতীয়ম চার রাষ্ট্র নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও কানাডা পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রথম সফল এভারেস্ট অভিযান করে ১৯৬৫ সালে। ক্যাপ্টেন অমরজিৎ সিংহ আলুওয়ালিয়ার নেতৃত্বে ওই অভিযানে ছিল ঘটনার ঘনঘটা। একসঙ্গে তিন দেশ ভারতীয় জওয়ানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অভিযানে অংশ নিয়েছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্রবল তুষার ঝড়, মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বেশ কিছুদিনের জন্য অভিযান বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর অবস্থা স্বাভাবিক হলে অভিযান শুরু হয় এবং এভারেস্ট বিজয় করে প্রথম টিম হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিশ্ব অভিযান মানচিত্রে জায়গা করে নেয়। ওই অভিযানের স্বর্ণজয়ন্তীতে ভারতীয় নৌবাহিনী ২০১৫-তে ২৪ সদস্যের অভিযাত্রী দলকে মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানে পাঠায়। 'সাগর তল থেকে সাগরমাতা' নাম দেওয়া হয়েছিল এই অভিযানের। দলটি কারওয়ার সমুদ্র থেকে যাত্রা শুরু করে ৬৬ দিন অভিযান চালিয়ে সাগরমাতা বা মাউন্ট এভারেস্টে উঠেছিল। ■

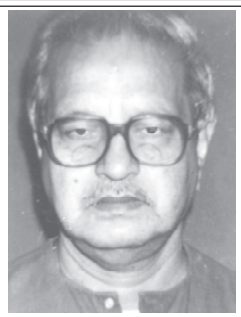

ত্রিপুরার সাম্প্রতিক পট পরিবর্তনের নেপথ্যে স্বর্গীয় শ্যামল সেনগুপ্ত (আমার পূজনীয় পিতৃদেব) সহ স্বর্গীয় সুধাময় দত্ত, স্বর্গীয় দীনেন্দ্রনাথ দে এবং স্বর্গীয় কাঞ্চন চক্রবর্তীর অবদান এবং আত্মবলিদান অবিস্মরণীয়। এঁরা সকলেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা ছিলেন।

আজ পরিবর্তনের শুভক্ষণে সমস্ত ত্রিপুরাবাসী সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা।

সেনগুপ্ত পরিবারের পক্ষে

সব্যসাচী সেনগুপ্ত

কলকাতা - ৫৯

সত্যি ঘটনা

মৈনু-র চোর ধরা

রিঙ্কুর বাবা বাড়িতে একটা ময়না পাখি এনেছেন। রিঙ্কুর মায়ের খুব পাখির শখ। এ আবার কথাবলা-পাখি! কথা শেখালে ময়না হুবহু তার মতো করে বলার চেষ্টা করে।

মা দুপুরে ময়নার খাঁচার সামনে বসে তাকে কথা শেখান। রিঙ্কুর শীতের ছুটি চলছে। সেও গভীর মনোযোগ সহকারে মায়ের বলা, পাখির শেখা দেখতে থাকে। মা বলেন— 'মৈনু বল— কৃষ্ণ, কৃষ্ণ'। ময়নাকে মা আদর করে 'মৈনু' বলে ডাকেন। রিঙ্কু অবাক হয়ে দেখে মৈনু ঘাড় বেঁকিয়ে কিছুক্ষণ শুনে, অপটু স্বরে বলে— 'খ্রিষ্ণ, খ্রিষ্ণ'। রিঙ্কু হেসে আটখানা। বলে— 'মা মৈনু বোধহয় কৃষ্ণ আর খ্রিস্ট'— দুটো মিলিয়ে খ্রিষ্ণ বলছে।'

মা বললেন— 'তবু তো ওইটুকু পাখি চমৎকার ভাবেই শিখে নিয়েছে।' এইভাবেই মৈনু বলতে শেখে— 'মা, লুচি দাও'। ঘরে লোকের হাসি শুনে, সে নিজের মতো 'হো হো' করে হাসে।

একদিন রাত্রে পাশের বাড়ি চোর এসেছে। তাঁরা চিৎকার করছে— 'চোর, চোর'। আর যায় কোথায়! শ্রুতিধর মৈনু সেটি শিখে ফেলল আর অদ্ভুত ভাবে প্রয়োগ করল— সঠিক জায়গায়।

রিঙ্কুর বাবা সুগারের রোগী। মিষ্টি খাওয়া বারণ। তবু লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্রিবেলা ফ্রিজ খুলে মিষ্টি খেতে ছাড়েন না। আজও তাই করলেন। আর মৈনু সঙ্গে সঙ্গে খাঁচায় বসে চেঁচিয়ে উঠল— 'চোর, চোর'। রিঙ্কুর বাবা বেজায় রেগে, কট্‌মট্‌ করে মৈনু-র দিকে তাকিয়ে প্রায় ছুটেই সেখান থেকে পালালেন।

আর একদিন রিঙ্কু ছাদে মায়ের শুকোতে দেওয়া আচারের কৌটোর ঢাকনা খুলে খাওয়ার চেষ্টা করতেই খাঁচা থেকে গলা বাড়িয়ে মৈনু চেঁচিয়ে উঠল 'চোর চোর'। চম্‌কে উঠে, মৈনুকে জিভ ভেঙিয়ে রিঙ্কু সেখান থেকে ছুটে পালাল।

কিন্তু মৈনু আর একদিনের ঘটনার মধ্য দিয়ে বাড়ির লোকের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠল। যে 'চোর চোর' আওয়াজে বাড়ির লোকদের সে বেসামাল অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল, সেই একই বাক্যবন্ধে সেদিন বাড়ির লোকদের অদ্ভুত ভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

একদিন রাত্রে আবার শোনা গেল মৈনুর গলায়— 'চোর, চোর'। রিঙ্কু ও তাঁর বাবা মা— চমকে জেগে উঠল। জানালা দিয়ে বাবা দেখলেন দুটো লোক ওদের গেটের তালা ভাঙার চেষ্টা করছে। মৈনুর 'চোর চোর' শুনে তারা ছুটে পালাচ্ছে। চীৎকারে লোক জড়ো হয়ে চোর দুটোকে ধরে ফেলল।

বাবা বললেন— 'বেঁচে থাক্‌ আমাদের মৈনু। এমন পাহারাদার আর কোথায় পাব? সেদিন থেকে মৈনুর যত্ন-আদর আরও বেড়ে গেল। ছাতুর বাটি খালি হবার আগেই নতুন ছাতুতে তা ভরে উঠতে লাগল। কালো কুচকুচে মৈনু লম্বা ঠোঁট খুলে সদ্য-শেখা 'হো হো' হাসিটা মনের আনন্দে হেসে চলল।

রূপশ্রী দত্ত

ভারতের পথে পথে

পাওয়াপুরি

জৈন তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে পাওয়াপুরি অন্যতম। পাটনা থেকে ৮০ কিলোমিটার পূর্বদিকে পাওয়াপুরি। জৈনধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর এখানেই নির্বাণলাভ করেন। মহাবীর ও ডাইনে বামে দুই ভক্তের পদচিহ্ন রয়েছে এখানে। মহাবীরের জন্মদিন অর্থাৎ দীপাবলির রাত্রে পদচিহ্নের ঢাকনা আপনা থেকেই সরে যায়। লোকের বিশ্বাস, এদিন উপস্থিতি ঘটে ভগবান মহাবীরের। দূরদূরান্ত থেকে এই বিশেষ দিনে ভক্তের ঢল নামে দেবদর্শনে। মহাবীরের অন্ত্যেষ্টি স্থলের নাম কমল সরোবর বা জলমন্দির।

জানো কি?

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'-র ইংরেজি অনুবাদের নাম দিয়েছেন 'মর্নিং সং অব ইন্ডিয়া'।
- জাতীয় সঙ্গীতে পাঁচটি স্তবক রয়েছে।
- ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি ভারত সরকার দ্বারা জাতীয় সঙ্গীত রূপে গৃহীত হয়।
- ১৯১১ সালে কলকাতায় প্রথম এই জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।
- শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত 'শ্রীলঙ্কামাতা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাব ও প্রেরণায় আনন্দ সমারকুল সিংহলি ভাষায় রূপ দেন।

ভালো কথা

শুভ'র ভুলু

আমাদের পাড়ার শুভ ক্লাস নাইনে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার সময় রোজ ওর সঙ্গে ওদের ভুলু যায়। আমরা স্কুলে পৌঁছে গেলেই ভুলু ফিরে আসে। ছুটির সময় দেখি ভুলু স্কুলগেটের বাইরে অপেক্ষা করছে। শুভ যে দিন স্কুলে আসে না, ভুলুকেও সেদিন দেখা যায় না। আমরা এ পাড়ায় নতুন এসেছি। একদিন শুভর মাকে জিজ্ঞাসা করতেই কাকিমা বললেন— ভুলুও তো আমার ছেলে। দাদাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া আসার কাজটা ওই করে। শুভর সঙ্গে আমার খুব ভাব। তবু মজা করার জন্য যদি কোনও দিন শুভকে একটু ধাক্কা দিই, তখন ভুলু আমার দিকে তাকিয়ে গর্‌র্‌ করতে থাকে। তবে ও কাউকে কামড়ায় না।

সৌম্যজিৎ সাহা, নবম শ্রেণী, দিপালীনগর, বালুরঘাট, দ:দি:।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

বাঁচতে যদি চাস

রিম্পা পোল্লে, দশম শ্রেণী, শ্যামপুর, হুগলী

নতুন করে স্বপ্ন দেখ বাঁচতে যদি চাস
নইলে তুই যাবি মরে বন্ধ হয়ে শ্বাস।
এগিয়ে আয় ভাঙতে ওই বদ্ধদ্বারের শিকল
কুসংস্কারের আগল ভেঙে এগিয়ে যাবি চল।
না হারিয়ে মনের সাহস বাড়িয়ে তারে তোলরে
আলোর পথে আলোর খোঁজে পাড়ি দিতে চলরে।
বিজ্ঞান মেনে চলরে সবাই ছেড়ে কুসংস্কার
তাকেও তোরা দে বুঝিয়ে ভুল হচ্ছে এখন যার।
কুসংস্কারে হচ্ছে শিকার হাজার হাজার প্রাণ
স্বপ্ন তাদের ভেঙেচুরে হচ্ছে খান্ খান্।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

With Best Compliments
From --

A
Well Wisher

Sabyasachi

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. প্রকাশনের স্থান : ২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬,
২. প্রকাশনের সময় : সাপ্তাহিক। **৩. মুদ্রকের নাম :** শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** পি/২০৩, পশ্চিম পুটিয়ারি কলোনী, সিএমসি-১১৫, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
৪. প্রকাশকের নাম : শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** পি/২০৩, পশ্চিম পুটিয়ারি কলোনী, সিএমসি-১১৫, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
৫. সম্পাদকের নাম : শ্রী বিজয় আঢ্য। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২৭/১, বি, বিধান সরণি, কলকাতা -৬। ৬. **মালিকানা :** স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট।
ঠিকানা : ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬।
ট্রাস্টের সদস্যবৃন্দ :
শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত, ৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা -৬।
শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, ৬৪, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা - ৬৭।
শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পি/২০৩, পশ্চিম পুটিয়ারি কলোনী, সিএমসি-১১৫, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
শ্রী সত্যনারায়ণ মজুমদার, পুড়াটুলী, মালদা।
শ্রী অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, ৯৫বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭৩।
শ্রী দেবাশিস লাহিড়ী, ২/৫, সর্ট রোড, দুর্গাপুর -৪।
শ্রী প্রদীপ কুমার দে, ১০/৩৮, বিজয়গড়, পোঃ যাদবপুর, কলকাতা-৩২।
শ্রী অদ্বৈত চরণ দত্ত, ৯-এ অভেদানন্দ রোড, কলকাতা - ৬।
শ্রী সারদা প্রসাদ পাল, ২০/৩, হালদার বাগান লেন, উল্টাডাঙ্গা, কলকাতা - ৪।
শ্রী মোহনলাল পারিখ, পারিখ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট, বি কে মার্কেট, ১৬বি, সেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা -৭০০০৭১
শ্রী তিলকরঞ্জন বেরা, নিউ টাউন, ইন্দা, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিনকোড ৭২১৩০৫।
আমি শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর
শ্রীরণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তারিখ ঃ ১৯.০৩.২০১৮

শোকসংবাদ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রবীণ কার্যকর্তা বালুরঘাটের

বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল গত ২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বীরেনবাবু পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রথম সম্পাদক ও পরে সভাপতির দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। শ্রীরামমন্দির আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়ে বিহারের দেওরিয়া জেলে কয়েকদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁর লেখা কয়েকটি বই এবং অসংখ্য প্রবন্ধ রয়েছে। তাঁর একমাত্র পুত্র রঞ্জন কুমার মণ্ডল অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য।

* * *

নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার প্রাক্তন সঙ্ঘচালক খগেন্দ্র জীবন দে গত ১১ ফেব্রুয়ারি চাকদহের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, ২ পুত্র, ২ কন্যা, নাতি-নাতনি-সহ অসংখ্য কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। ১৯৯১ সালে ভারতীয় রেলওয়ে থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি স্বয়ংসেবক হন। অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত সঙ্ঘের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এলাকায় তিনি সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

* * *

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তুষারকান্তি গুহ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি বাঁকুড়া জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
19 March - 2018 - Rs. 10.00

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০্টাকা।।